অক্টোবর ২০২০ ❑ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৭

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

রাসেলের জন্য অপেক্ষা

মো. ইরফান হোসেন, নার্সারি শ্রেণি, মা কিন্ডার গার্টেন স্কুল, ঢাকা

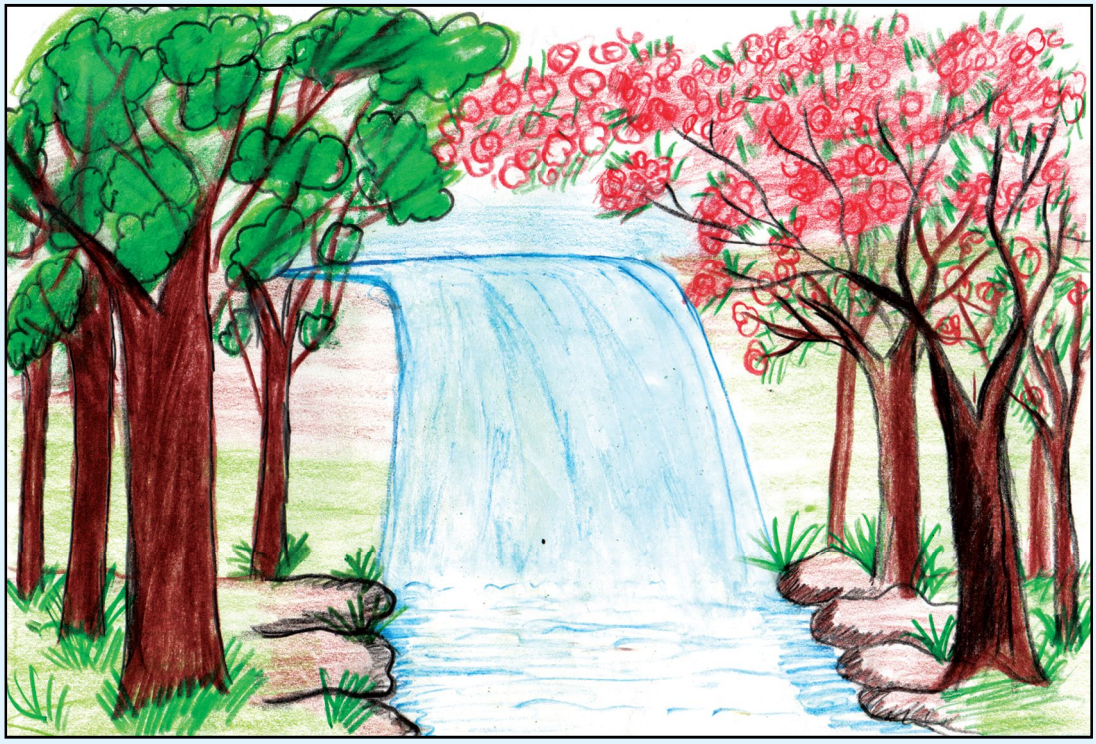

নাওশিন শারমিলি নাফলিন, ৮ম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
অক্টোবর ২০২০ ❑ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৭

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মো. হুমায়ুন কবীর

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখ শেখ রাসেলের ৫৬তম জন্মদিন। ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর সড়কের বাসায় ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেলের জন্ম । তাঁর বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ সন্তান ছিল শেখ রাসেল। তাই সে ছিল সবার আদরের ধন।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা তো জানো, এই শিশুটি তাঁর শৈশবকালের আনন্দ উপভোগ করতে পারেনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সেই ভয়াল রাতে বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের সবার সাথে সেও ঘাতকের বুলেটের শিকার হয়।

বন্ধুরা, শেখ রাসেল নামটি শুনলেই মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। পুরো বাঙালি এই দুঃখ হৃদয়ে ধারণ করে। তবে আনন্দ একটাই শেখ রাসেলের প্রিয় হাসু আপা সেই খুনিদের বিচার করতে পেরেছেন। বিচারিক কাজ চলছে শেখ রাসেলসহ ১৫ই আগস্ট কালরাতের সব হত্যাকাণ্ডের।

ছোটো সোনামনিরা, অক্টোবর মাসেই বিশ্ব শিশু দিবস, এ সময়ে বিশ্ব শিশু অধিকার সপ্তাহ পালিত হয়। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাই শিশুদের প্রতি ভালোবাসা ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় ১৯৫৯ সাল থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়। এটি নির্ধারণ করেছে জাতিসংঘ। এবারের আয়োজনের স্লোগানটি হচ্ছে:

‘শিশুর সাথে শিশুর তরে
বিশ্ব গড়ি নতুন করে’

বিশ্ব শিশু দিবস ও শেখ রাসেলের জন্মদিনে শিশুদের প্রতি রইল অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। আমাদের কামনা কোনো শিশুর জন্মগত অধিকার যেন খর্ব না হয়। শিশুদের স্বপ্নের ভুবন হবে আলোয় ভরা, আনন্দে ভরা। এতেই সফল হবে বিশ্ব শিশু দিবস ও শেখ রাসেলের জন্মদিন। ■

সূচি

নিবন্ধ

০৩ রাসেলের জন্য অপেক্ষা/ সেলিনা হোসেন
১৭ গোলবনের সুন্দরী হাঁস/আ ন ম আমিনুর রহমান
২৫ জোড়া বিশেষ্য ও বাক্য সর্বনাম/নাসী এল বারী
২৭ মুক্তিযোদ্ধাদের স্কুল/মো. নুরন্নবী খন্দকার
৩১ সাগরে সাঁতার কাটা সহজ কেন?/তারেকুর রহমান
৪৫ শিখতে হলে দেখতে হবে/শাহানা আফরোজ
৪৮ বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫০ বঙ্গোপসাগরের সবচেয়ে গভীরতম স্থান/ইফতেখার আলম
৫২ বিশ্বের প্রথম হলুদ পদ্ম বাংলাদেশে/ মেজবাউল হক
৫৩ পাঁচ কিশোরীর আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ জান্নাতে রোজী
৫৫ অবহেলা করো না/মো. জামাল উদ্দিন
৫৭ করোনাকালের শিক্ষাজীবন/মুমিনা নাহার সুষমা
৫৮ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৬০ জাতিসংঘের সর্বকনিষ্ঠ বিচারক/রুবাইয়াত হোসেন
৬১ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ
৬৩ বুদ্ধিতে ধার দাও সেপ্টেম্বর ২০২০ -এর সমাধান

গল্প

১০ শেখ রাসেলের ইচ্ছে ঘোড়া/রফিকুর রশীদ
৩২ হরিণ ছানা আর বাঘ/আরিফুল ইসলাম
৩৫ দোয়েলের শিস/আরাফাত শাহীন
৪২ বুদ্ধিমান তাঁতি/আশরাফ আলী চারু
৪৪ রাজহাঁস ও বনবিড়াল/ওয়াহিদ মুস্তাফা

বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনি

২১ এলিয়েনদের এক্সপেরিমেন্ট/আশরাফ পিন্টু

কবিতা

০৯ জান্নাতুল ফেরদৌস মিম
২০ মোহা. রাকিবুল ইসলাম/ আইরিন আক্তার
৩০ আবিদ হোসেন/মোহাম্মদ ইলইয়াছ
৪১ আমিরুল হক/ ফারুক হাসান
৪৯ রুস্তম আলী/ইহান মুকসিত

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবিতা

১৪ তাসনিন আক্তার শিফা/ মাইদুল ইসলাম

শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কবিতা

১৫ শশধর চন্দ্র রায়/ আ.ফ.ম. মোদাচ্ছের আলী/ সাকিব জামাল
১৬ পরিতোষ বাবলু/ নুসরাত জাহান

বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষ্যে কবিতা

৩৪ মো. হাসু কবির/ মায়মুনা হোসেন

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: মো. ইরফান হোসেন/নাওশিন শারমিলি নাফসিন
শেষ প্রচ্ছদ: মো. ইহসানুল হক (সিফাত)
৪৩ ফাতিমা তাহানান
৫৪ মো. রাফিউল ইসলাম
৫৬ জায়েদ রাকিব
৫৯ সানজিদা আক্তার রুপা/ আব্দুর রহমান আবরার
৬০ রুকাইয়া বিনতে শরীফ
৬৪ সারিকা তাসনীম/ফামিন আজিজ

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

রাসেলের জন্য অপেক্ষা

সেলিনা হোসেন

স্কুলে যাওয়া এখন রাসেলের কাছে ভীষণ আনন্দের। আছে বন্ধুরা, আছে কত ধরনের লেখাপড়া! ভোরে ঘুম ভাঙলে প্রথমে কবুতরের বাকুম-বাকুম ডাক শোনে। তারপর স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হতে থাকে। মা বলেন, আমার লক্ষ্মী ছেলে। প্রথমে যখন স্কুলে ভর্তি হয়েছিল তখন স্কুলে যেতে চাইত না। বলতো যাব না, ভালো লাগে না। এখন আর বলে না। বাড়ির সবাই স্বস্তিতে আছে। ওর স্কুলের জামা জুতো নিয়ে পিছে পিছে ঘুরতে হয় না। গোমরা মুখ দেখতে হয় না। ছলোছলো চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে হয় না, লেখাপড়া শিখে অনেক বড়ো হবে তুমি সোনামানিক।

এখনও স্কুলে যাবার জন্য রেডি হয়ে দৌড়ে কবুতরের খোপের সামনে গিয়ে হাত নেড়ে বলে, স্কুলে যাচ্ছি বাকুম-বাকুম ভায়েরা। স্কুল থেকে ফিরে এসে তোমাদেরকে সরষে খাওয়াব। বাই-বাই।

ক্লাসে রোল কলের সময় টিচার যখন নাম ডাকেন তখন ও হাত তুলে বলে, এই তো আমি। রাসেল এমন অন্যরকম উত্তর দিয়ে সবার মন কেড়েছে। ছেলে-মেয়েরা ওর রোল কলের উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করে। ক্লাস শেষে বলে, দারুণ বলেছ।

ক্লাসে সবার সঙ্গেই রাসেলের বন্ধুত্ব আছে। এরমধ্যে চার-পাঁচজন ওর খুব কাছের বন্ধু। ওদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে অঙ্ক করে, ভূগোলের বই খুলে ম্যাপ দেখে। দেশ চেনা হয়। বাংলা বইয়ের ছড়াগুলো তো দারুণ মজার। বেশ কয়েকটি ছড়া মুখস্ত করেছে। গড়গড়িয়ে বলতে পারে। যখন বলে তখন সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনে। ও এখন ক্লাস ফোরের ছাত্র। স্কুল ছুটির দিনে কারো বাড়িতে গিয়ে খেলা করে, নইলে অন্য কোথাও বেড়াতে গিয়ে মজা করে। কোনো কোনো দিন বন্ধুরা ওর বাড়িতে আসে। সেদিন মা ওদের ভাত খাওয়ায়, নইলে পিঠা-পায়েস। বেশ আনন্দে দিন কাটে রাসেলের। এত কিছুর পরেও রাসেলের মনে হয় দুলালের সঙ্গে বন্ধুত্ব ওকে গভীর আনন্দ দেয়। এই আনন্দ ক্লাসের বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। দুলালের বড়ো চোখে মায়া ভরা দৃষ্টি খুব পছন্দ করে রাসেল। শুধু ওর একটাই দুঃখ যে দুলাল ওকে বলেছে, ও কোনোদিন স্কুলে যায়নি।

এ কথা বলার সময় দুলালের চোখ ছলোছলো করছিল। দুলাল দু'হাতে চোখ মুছে ফিক করে হেসে বলেছিল, তুমি আমাকে বন্ধু করেছ সেজন্য আমার খুব গর্ব হয় রাসেল। মা বলেন, আমার ভাগ্য খুব ভালো। দুলালের মুখের দিকে তাকিয়ে রাসেলের দুঃখ কমে না। বুক জানি কেমন করে। ভাবে, আহা রে ওকে যদি স্কুলে ভর্তি করা যেত! দুলাল বাদামের টুকরি নিয়ে টিফিন পিরিয়ডের আগেই স্কুলের সামনের গাছের গোড়ায় বসে থাকে। ছেলে-মেয়েরা ভিড় করে ওর কাছ থেকে বাদাম কেনে। রাসেল ভিড় কমলে ওর সামনে গিয়ে কাগজে মোড়ানো সিঙ্গাড়াটা দুলালকে দেয়। বলে, তোমার জন্য। তুমি খাবে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব। দুলাল বিগলিত হেসে বলে, এটাই আমার দুপুরের খাবার। একটা সিঙ্গাড়াতেই পেট ভরে যাবে। মাকে বলব, মাগো আমি দুপুরে পেট ভরে খেয়েছি। আমার বন্ধু রাসেল খাইয়েছে। বাড়ি যাবে না?

না। আগে সব বাদাম বিক্রি হবে, তারপর বাড়ি যাব। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজলে দুলাল তড়িঘড়ি করে বলে, তুমি ক্লাসে যাও বন্ধু।

যাই, কালকে আবার দেখা হবে। আসবে তো?

আসব। তোমার সঙ্গে কথা না হলে আমার ভালো লাগে না। মন খারাপ থাকে। মা জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে দুলাল? আমাকে বল। আমি মাকে কিছুই বলতে পারি না। ছুটির দিনে কী করো? রমনা পার্কে গিয়ে বাদাম বিক্রি করি। সেদিন আমি ঘুরে ঘুরে বাদাম বিক্রি করি। ভাবি, যদি তুমি পার্কে বেড়াতে আসো, তাহলে হয়ত তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। রাসেল খুশি হয়ে বলে, তুমি আমার সোনার বন্ধু। একদিন আমি ঘুড়ি নিয়ে রমনা পার্কে যাব। দুজনে মিলে ঘুড়ি ওড়াবো। আর মাকে বলব, তোমার ঝুড়ির সব বাদাম কিনে নিতে। দুলাল চোখ উজ্জ্বল করে বলে, সত্যি? হ্যাঁ বন্ধু, সত্যি।

পরদিন রাসেল স্কুলের ক্যান্টিন থেকে সিঙ্গাড়া কিনে দৌড়ে আসে দুলালের কাছে। দুলাল ওর কাছ থেকে সিঙ্গাড়া নিয়ে খেতে শুরু করে। রাসেলের মনে হয় ওর খুব খিদে পেয়েছে। খেয়েদেয়ে দুলাল বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, আজ আমার কিছু খাওয়া হয়নি। পান্তাভাতও ছিল না। কয়দিন ধরে মায়ের অসুখ। মা কাজে যেতেও পারে না। তোমাকে তো বলছি বন্ধু যে আমার বাবা নাই। হ্যাঁ বলেছ। সেজন্য তোমার স্কুলে পড়া হয়নি। আচ্ছা দুলাল, তোমার জন্য আমি প্রিন্সিপাল আপাকে বলব? কী বলবে? দুলাল অবাক হয়। প্রিন্সিপাল আপাকে বলব তোমাকে স্কুলে ভর্তি করে নিতে। ক্লাস ফোরে। তুমি আর আমি একসঙ্গে পড়ালেখা করব। এক বেঞ্চে বসব। দুর বোকা, তা কী করে হবে! আমি তো কিছুই লেখাপড়া জানি না।

ও, তাই তো। আমাদের স্কুলে তো তোমাকে অ, আ শেখাবে না। তুমি যদি ছুটির দিনে আমাদের বাড়িতে আসো তাহলে তোমাকে বাংলা, অঙ্ক সব শেখাব। তখন তুমি স্কুলে ভর্তি হয়ে যেতে পারবে।

না বন্ধু, আমার স্কুলে ভর্তি হওয়া হবে না। কেন? রাসেল প্রশ্ন করে তাকিয়ে থাকে। দুলাল ঘাড় নামিয়ে বলে, বাদাম বিক্রি করে আমি যা আয় করি তা দিয়ে মা চাল কেনে। ও, তাই তো। তাহলে কী হবে? কিছু হবে না। বাদাম বিক্রি করতে করতে আমি একদিন বড়ো হবো। আর তুমি পড়ালেখা শিখে অনেক বড়ো হবে। তখন তুমি আমার বন্ধু থাকবে তো? থাকব, একশবার থাকব। আমরা সারা জীবন বন্ধু থাকব।

রাসেল দুহাত দিয়ে দুলালের হাত জড়িয়ে ধরে।

ক্লাসে ফেরার ঘণ্টা বাজে। টিফিন পিরিয়ড শেষ। দুলাল প্রতিদিনের মতো বলে, যাও বন্ধু। রাসেল ছুট দেয়। একদৌড়ে ক্লাসে এসে পৌঁছায়। স্যার তখনও আসেননি। টুটুল রাসেলকে বলে, ওই পচা ছেলেটার সঙ্গে তোমার যে কী এত কথা বুঝি না। তুমি আমাদেরকে সিঙ্গাড়া দিয়ে ওর জন্য একটা নিয়ে যাও। রাসেল বিষণ্ন স্বরে বলে, ও একটা দুঃখী ছেলে টুটুল।

দেশে তো গরিব মানুষ আছে। থাকবেও। তাই বলে বন্ধুত্ব করতে হবে নাকি? রাসেল দৃঢ় কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে, হবে। করতে হবে। যারা গরিবদের চিনতে চায় না তারা মানুষ না। তাহলে তারা কী? বলো কী? টুটুল রুখে ওঠে। এই তোমার মতো বানর। হেসে গড়িয়ে পড়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে-মেয়েরা। হা-হা হি-হি হাসির - তোড়ে ভেসে যায় ক্লাসঘর। টুটুল রাগে ফস ফস করে। চেঁচিয়ে বলে, দেখাব মজা। বুঝবে তখন।

অন্য একজন বলে, ওকে আর কী বোঝাবি? ও তোর চাইতে বেশি বোঝে। ওর মতো ভালো ছেলে তুই হতে পারবি না।

আর একজন বলে, দুলালকে কীভাবে ভালোবাসতে হয় তা তুই শিখিসনি রে গেছো বানর। হা-হা হাসির তোড় ছোটে আবার। হাসির তোড়ে চুপসে যায় টুটুল। আর কথা বলতে পারে না।

তখন স্যার ঢোকেন ক্লাসে। এই তোমাদের কী হয়েছে? কী জন্য এত হাসাহাসি? সবাই চুপ করে বসো। ছেলে-মেয়েরা চুপ করে বসে পড়ে। এখন অঙ্ক ক্লাস শুরু হবে। ক্লাস শেষ হলে টিচার বেরিয়ে যাবার আগে বললেন, তোমাদের জন্য একটি খুশির খবর আছে। খুশির খবর? কী খবর স্যার?

আজ ১২ই আগস্ট। আর তিন দিন পরে আমাদের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন। কেন প্রেসিডেন্ট আসবেন স্যার? বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হবে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সার্টিফিকেট দেবেন। তোমরা তো জানো আমাদের ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত। সেজন্য আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রেসিডেন্টকে ফুল দেবে। হ্যাঁ, আমরাও ফুল দেবো স্যার। আমরা অনেক ফুল দিতে চাই। আমরা প্রেসিডেন্টকে ফুল দিয়ে ভরিয়ে দেবো। উহ্, কি মজা হবে। প্রেসিডেন্ট আমাদের মাথায় হাত রেখে বলবেন, তোরা অনেক বড়ো হবি। ছেলে-মেয়েরা খুশির স্বরে চেঁচামেচি করে। টিচার চলে গেলে হুড়মুড়িয়ে বের হয় ওরা। মুখে মুখে নানা কিছু গল্প করে। কে কী ফুল আনবে সে কথাও বলে। রাসেলের মনে হয় ওদের সঙ্গে দুলাল ফুল দিতে পারবে না কেন? ও প্রিন্সিপাল আপাকে বলবে দুলালকে ওদের সঙ্গে যেতে দিতে। নিজেই আবার ভাবে, দুলাল তো কোনো ক্লাসে পড়ে না, তাহলে কী হবে? ও খুশি হয়ে ভাবে, প্রিন্সিপাল আপা বললে সবই হবে। এমন ভাবনায় নিজে নিজেই আশ্বস্ত হয় ও। এই মুহূর্তে দুলালকে খুশি করার চিন্তা ওকে উৎফুল্ল করে রাখে। ছুটির সময় বের হলে দেখতে পায় দুলাল বসে আছে। সব বাদাম বিক্রি হয়ে গেছে। শূন্য ঝুড়ির মাঝখানে নিজের কাঁধের গামছা ভাঁজ করে রেখেছে। কিন্তু ওকে খুবই বিষণ্ন দেখাচ্ছে। রাসেলের খুব মায়া হয়। কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, কী হয়েছে তোমার? বাড়ি যাওনি? আজ তোমার সব বাদাম বিক্রি হয়ে গেছে দেখছি। হ্যাঁ বন্ধু, আজ আমার খুশির দিন। মায়ের জন্য দুধ কিনে বাড়ি যাব। কখন যাবে? রাসেল ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। এই তো যাব। তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। কিছু বলবে আমাকে?

আমরা কবে একসঙ্গে রমনা পার্কে ঘুড়ি ওড়াব বন্ধু?

কবে? রাসেল এক মূহূর্ত ভাবে। বলে, ১৫ই আগস্টের আগে হবে না। আচ্ছা মাকে জিজ্ঞেস করে দেখব। মা আমাকে কবে যেতে দেবে, তা আমাকে মায়ের কাছ থেকে জানতে হবে বন্ধু। আমরা ১৫ই আগস্টের আগে কেন যেতে পারব না? বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেসিডেন্ট আসবেন। আমরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে ফুল দিব। আমি ফুল দিতে পারব? কালকে প্রিন্সিপাল আপাকে জিজ্ঞেস করে দেখব। আপা অনুমতি দিলে তোমাকে আর ঠেকায় কে? তুমি আর আমি আব্বাকে একসঙ্গে ফুল দেবো। আব্বাকে বলব, ও আমার বন্ধু দুলাল। আব্বা তোমাকে আদর করে দেবে। সত্যি আমাকে আদর করে দেবে? ও আল্লাহ রে, আমার কত ভাগ্য। কিন্তু রাসেল, প্রিন্সিপাল আপা যদি রাজি না হন? রাসেল চুপ করে থাকে। প্রিন্সিপাল আপা রাজি না হলে ও কী করবে! তাহলে দুলালের মন খারাপ হবে। বন্ধুর মন খারাপ হলে ওর নিজেরও মন খারাপ হবে। দুলাল আস্তে করে বলে, তুমি কী ভাবছ বন্ধু? প্রিন্সিপাল আপাকে তুমি বলবে যে, আমি তোমার বন্ধু। আর শোনো আমার একটি লাল জামা আছে। আমি সেদিন ওই জামাটা পরব। তোমাদের মতো স্কুলের জামা তো আমার নাই। যেদিন আমরা রমনায় ঘুড়ি ওড়াতে যাব সেদিনও আমি ওই লাল জামাটা পরব।

রাসেল মৃদু হেসে বলে, লাল জামা পরলে তোমাকে খুব সুন্দর দেখাবে দুলাল। সেদিন তুমি আর আমি একটা ছবি তুলব। উহ খুব মজা হবে। আমি কখনো ছবি তুলিনি। আমার কোনো ছবি নাই। এখন আমার খুব আফসোস হচ্ছে। আবার খুশি লাগছে যে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম ছবি তোলা হবে।। দুলালের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রাসেলের মনে হয় ওর চোখটা নীল

আকাশের মতো ঝকঝকে। সেই চোখের খুশির আভা সাদা মেঘের মতো লাগছে। খালি ঝুড়ি উঠিয়ে নিয়ে দুলাল বলে, যাই। মাকে গিয়ে বলব তুমি আমার সঙ্গে আজ অনেক গল্প করেছ। রাসেল ঘাড় কাত করে। দুলালের চলে যাওয়া দেখে দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠে। ১৪ই আগস্টের সকালবেলায় এসেম্বলির সময় প্রিন্সিপাল আপা বলেন, কাল তোমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে স্কুলে আসবে। কারো ইউনিফর্ম যেন ময়লা না থাকে। আমরা ফুল নিয়ে আসব। গোলাপের পাপড়ি নিয়ে আসব। তোমরা সবাই তো আমাদের প্রেসিডেন্টের নাম জানো? জানি আপা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ছোটোদের কণ্ঠস্বরে বাতাসে বয়ে যায় স্কুলের মাঠ, বাগান, দালানের ওপর দিয়ে। উড়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, রাস্তায় আরও দূরে রমনা পার্কের দিকে। প্রিন্সিপাল ওদের কণ্ঠস্বর থামলে বলেন, তিনি আমাদের জাতির পিতা তিনি তোমাদেরকে খুব আদর করবেন। তোমরা ডিসিপ্লিনের সঙ্গে তাঁকে একে একে ফুল দেবে। কোনো হইচই গোলমাল করবে না। ঠিক আছে? ঠিক আছে আপা। আবার ওদের সমবেত কণ্ঠস্বর বাতাসে উড়ে যায়। সেদিন টিফিন পিরিয়ডে অনেকগুলো সিঙ্গাড়া কিনে রাসেল। ক্লাসের বন্ধুদের একটি করে দিয়ে ছুটে আসে গেটের বাইরে। দেখে দুলাল হাসিমুখে বাদাম বিক্রি করছে। অল্প সময়ে বাদামগুলো বিক্রি হয়ে যায়। দুলাল খুব খুশি। রাসেল কাছে গেলে বলে, দেখো বন্ধু সব বাদাম বিক্রি হয়েছে। আজ আমি মায়ের জন্য একটা মুরগি কিনব। ছোটো বাচ্চা মুরগি। আজ আমার খুশির দিন বন্ধু। মাকে খুশি করতে পারলে আমার খুব ভালো লাগে। মনে হয় পাহাড়ের মাথায় উঠেছি। হা-হা করে হাসে রাসেল। বলে, তোমার মতো আমিও মাকে খুব ভালোবাসি। মায়ের জন্য আমার কিছু কিনতে হয় না। বড়ো হলে আমি মায়ের জন্য অনেক কিছু কিনব। মা বলবে, এত কিছু কী কিনতে হয় রে বাবা। দু'জনে হাসতে থাকে। ভাবে মায়ের কথা ভাবলে আনন্দে মন ভরে যায়। মায়ের আদর না পেলে মন খারাপ হয়। দু'জনের মাথার ওপর তিন-চারটি কাক গাছের ডালে বসে কা-কা করে ডাকে। রাসেল দুলালের হাত ধরে বলে, আজ আমি তোমার সঙ্গে সিঙ্গাড়া খাবো। চলো ওই গাছের নিচে বসি। গাছের নিচে বসব? দুলাল ইতস্তত করে, এগিয়ে যায় না। চলো না, আমার আবার ক্লাসে যেতে হবে তো। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে সিঙ্গাড়া খাই না কেন? কেন, গাছের নিচে বসতে অসুবিধা কী?

আমার ভয় করে। ভয়? কীসের ভয়? আমরা তো দুষ্টুমি করব না। সিঙ্গাড়া খাব আর গল্প করব। দেখবে আমাদের পায়ের কাছে ব্যাঙ আসবে। চলো, চলো। রাসেল ওর হাত ধরে টানে। জোরেই টানে। দুলাল কথা না বাড়িয়ে রাসেলের সঙ্গে যায়। মাঠের ধারের শিরীষ গাছের নিচে দু'জনে বসে। রাসেল সিঙ্গাড়ার প্যাকেট ছিঁড়ে বলে, আজ তোমার জন্য আমি দুটো সিঙ্গাড়া এনেছি। দুইটা? কেন? দুলালের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আজ আমারও খুশির দিন। কালকে আব্বাকে ফুল দিব।

কাল আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব তো?

আমি প্রিন্সিপাল আপাকে জিজ্ঞেস করিনি। তুমি সিঙ্গাড়া খাও আমি একদৌড়ে জিজ্ঞেস করে আসি। আপা আমাকে অনেক আদর করেন। নিশ্চয়ই আমার কথায় রাজি হবেন। কথা বলা শেষ করে রাসেল এক ছুটে গেটের ভেতর ঢুকে পড়ে। আবার অল্পক্ষণে ফিরে আসে। মন খারাপ। প্রিন্সিপাল রাজি হননি। দুলাল বলে, বুঝেছি। আপা রাজি হননি। না? হ্যাঁ, আপা রাজি হননি। বলেছেন, ও তো স্কুলের ছাত্র না। ওকে তোমাদের সঙ্গে নিলে স্কুলের ডিসিপ্লিন নষ্ট হবে। সেটা আমি করতে পারি না। দুলাল কথা বলতে পারে না। ওর মাথা বুকের ওপর নেমে যায়। ওর চোখে পানি। রাসেল ওর হাত ধরে বলে, দুলাল কালকে তোমার লাল জামাটা পরা হবে না। আমি মাকে বলব আমাকেও একটি লাল শার্ট বানিয়ে দিতে। দুজনে লাল শার্ট পরে রমনা পার্কে ঘুড়ি ওড়াব। কেমন? কবে বন্ধু? কবে আমরা ঘুড়ি ওড়াব। উহ, আমি খুশি রাখতে পারছি না। কাল তো ১৫ই আগস্ট। কালকের পরে একদিন। দু'জনে খুব মজা করব সেদিন। আমি মাকে বলব আমাদের দুজনের জন্য লাল ঘুড়ি কিনে দিতে হবে? খুব হবে। আমি খুব খুশি হয়েছি। ঘুড়ি ওড়ানোর চিন্তায় আজ রাতে আমার ঘুম হবে না। রাসেল দুলালের হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলে, যাই বন্ধু।

ক্লাসে সবার সঙ্গেই রাসেলের বন্ধুত্ব আছে। এরমধ্যে চার পাঁচজন ওর খুব কাছের বন্ধু। ওদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে অঙ্ক করে, ভূগোলের বই খুলে ম্যাপ দেখে। দেশ চেনা হয়। বাংলা বইয়ের ছড়াগুলো তো দারুণ মজার। বেশ কয়েকটি ছড়া মুখস্ত করেছে। গড়গড়িয়ে বলতে পারে। যখন বলে তখন সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনে ও এখন ক্লাস ফোরের ছাত্র। স্কুল ছুটির দিনে কারো বাড়িতে গিয়ে খেলা করে, নইলে অন্য কোথাও বেড়োতে গিয়ে মজা করে। কোনো কোনো দিন বন্ধুরা ওর বাড়িতে আসে। সেদিন মা ওদের ভাত খাওয়ায়, নইলে পিঠা-পায়েস। বেশ আনন্দে দিন কাটে রাসেলের। এতকিছুর পরেও রাসেলের মনে হয় দুলালের সঙ্গে বন্ধুত্ব ওকে গভীর আনন্দ দেয়।

আমি তোমার সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য দিন গুনব। অবশ্যই গুনবে। তোমার বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। যাই। কবে যাব তারিখটা আমাকে আগে জানাবে। আমি মাকে বলব তোমার জন্য পিঠা বানিয়ে দিতে। হুররে-পিঠা-পিঠা– রাসেল দৌড়ে গিয়ে স্কুলে ঢোকে। দুলাল শূন্য ঝুড়িটা দুহাতে ধরে রাসেলের চলে যাওয়া দেখে। ওর বুকের ভেতর খুশির ধ্বনি গুনগুন শব্দ করে। বাবুপুরা রেললাইনের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি চলে যায়। ওর ঘর বাবুপুরা বস্তিতে। ও কুউ-উ-- ঝিকঝিক করতে করতে রাস্তায় হাঁটে। ওর মাথায় এখন একইরকম শব্দ। শুধুই খুশি। ও গাড়ির হর্ন শুনতে পায় না। মানুষের কণ্ঠস্বরও না। ওর মনে হয় ওর চারদিকে শুধুই পাখি ডাকছে। কত নাম না জানা পাখি। কত ধরনের ডাক ভাসছে চারিদিকে। ও চারদিকে তাকিয়ে গুনগুনিয়ে গান গায়। খুশি মনে বাড়ি ফেরে।

ভোর রাতের দিকে মা দুলালকে ঠেলে ঘুম থেকে ওঠায়। মায়ের কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক, ও বাবা দুলাল, উঠ রে। কী হয়েছে মা? দুলাল ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে রে। ওর মা আতঙ্কে অস্থির কণ্ঠে বলতে থাকে, কোথায় এত গুলি হচ্ছে? ও আল্লাহ রে– দুলাল মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, কোথায় গুলি হচ্ছে তা বাইরে গিয়ে দেখে আসি মা? আমার খুব ভয় করছে। না, না, এখন বাইরে যেতে হবে না। আমরা চুপ করে বসে থাকি। গুলির শব্দ বন্ধ হলে আমরা বাইরে বের হব। দুলাল মন খারাপ করে বসে থাকে। ভাবে, তাহলে আজকে কি প্রেসিডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে আসবেন না? রাসেল তো বলেছিল আজকে ওর খুব খুশির দিন। পরক্ষণে ভাবে, গুলি তো অন্য কারণেও হতে পারে! তবে ও কেন প্রেসিডেন্টের কথা ভাবছে? আবার মনে হয়, ভাবতে তো হবেই। গোলাগুলির মধ্যে কি প্রেসিডেন্ট আসতে পারবেন? না, না তার গোলাগুলির মধ্যে বের হওয়া ঠিক হবে না। মা-ছেলে অনেকক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকে। দেখতে পায় বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরে আলো ঢুকছে। ভোর হলে ওরা ঘরের ঝাঁপ ফাঁক করে বাইরে তাকায়। দেখতে পায় আশেপাশে লোকজন জড়ো হয়েছে। সবার চেহারা কুঁকড়ে আছে। কেউ ভীত, কেউ আতঙ্কিত। কেউ একজন চিৎকার করে বলে, আর্মি আমাদের প্রেসিডেন্টকে মেরে ফেলেছে। হায় আল্লাহ রে– দুলাল চিৎকার করে ওঠে, ও মাগো এইসব কি শুনি। রাসেল আমাকে কালকে বলেছে, আজকে আমি আব্বুকে ফুল দিব দুলাল। ও মাগো ওর কথা শুনে আমি মনের খুশিতে বাড়ি আসি। ও মাগো দুলাল কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কোলে নেতিয়ে পড়ে। ও জ্ঞান হারায়। মা কলসি থেকে পানি নিয়ে ওর চোখেমুখে ছিটিয়ে দেয়। তালপাখা দিয়ে বাতাস করে। গভীর মমতায় ছেলের কপালে হাত রাখে। মৃদুস্বরে ডাকে, ও

প্রিয় রাসেল

জান্নাতুল ফেরদৌস মিম

বঙ্গবন্ধুর ছোট্ট ছেলে
শেখ রাসেল তার নাম
লেখাপড়া আর খেলাধুলায়
তার ছিল বেশ সুনাম
খেলতেন নানান রকম
মজার সব খেলা
তাই নিয়ে কাটিয়ে দিতেন
আনন্দে সারাবেলা

১০ম শ্রেণি, শুকুরজান জিন্নাত আলী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, সাভার

আমার বাবা, ও আমার সোনা। চোখ খোল রে, আমার মানিক। এক সময় আস্তে আস্তে চোখ খোলে দুলাল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলে, তোমার বটিটা কোথায় মা? বটি? বটি দিয়ে কী করবি? মা ওর দু'হাত আঁকড়ে ধরে। কারা প্রেসিডেন্টকে খুন করেছে তাদেরকে আমি দেখতে যাব। যেই হাত দিয়ে গুলি দিয়েছে সেই হাত কেটে আমি রমনা পার্কে ঝুলিয়ে রাখব। ও আমার সোনা রে— মা দু'হাতে ছেলেকে বুকে টানে। দুলাল মায়ের হাত সরিয়ে বলে, ছাড়ো আমাকে। আমি রাসেলের কাছে যাব। রাসেল কেমন আছে তা তো আমার জানতে হবে। মাগো।

ও চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। মা টের পায় ওর জ্বর এসেছে। ও আবার নেতিয়ে পড়েছে। মা ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পাখা হাতে বসে থাকে। তার চোখের পানি অনবরত গড়ায়। টানা কয়েকদিন জ্বরে ভুগে দুলাল সুস্থ হয়। মা ওকে এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারেনি। তারপরও ভালো হয়েছে দুলাল। এখন ও মাকে বলছে, আমি আবার বাদাম বিক্রি করব। রাসেলের সঙ্গে আমার দেখা হবে। সে রাতে রাসেলও মারা গেছে এ খবর মা জানে, কিন্তু দুলালকে কিছু বলে না। ও জানে শুধু প্রেসিডেন্ট মারা গেছে। এরপর কয়েকদিন দুলালের বাদাম বিক্রি করতে যাওয়া হয় না। একদিন স্কুলের সামনে গিয়ে দেখতে পায় স্কুল বন্ধ। সুনসান এলাকা। চারদিকে লোকজন তেমন কেউ নেই। ওর ভয় করে। ও বাড়ি ফিরে আসে। মাকে কিছু বলতে পারে না। মন খারাপ করে বসে থাকে ও। আরো কয়েকদিন পরে আবার স্কুলে যায়। দেখতে পায় স্কুল খোলা। তবে ছাত্রছাত্রী বেশি নেই। রাসেলের ক্লাসের যাদেরকে ও চেনে তারা কেউই আসেনি। অন্য ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হয় না ওর। ও গেটের ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এক সময় দেখতে পায় রাসেলের বাংলা টিচার রিকশা থেকে নামছেন। ও দৌড়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। স্যার-স্যার-স্যার। দুলাল তুই? তুই এখানে কী করছিস? আমার বন্ধু রাসেল কবে স্কুলে আসবে স্যার? আমি তো ওর জন্য আসি।

বাংলা টিচার ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিছু বলতে পারেন না। দুলাল আবার বলে, আমি বন্ধুকে খুঁজতে আসি। কিন্তু পাই না। আমি শুনেছি আমাদের প্রেসিডেন্টকে মেরে ফেলা হয়েছে। সেজন্য কি রাসেল স্কুলে আসে না স্যার? রাসেল আমাকে বলেছিল, আমরা দুইজনে রমনা পার্কে ঘুড়ি উড়াতে যাব স্যার। বাংলা টিচার দুলালের মাথায় হাত রাখেন। স্যার, ও যখন ক্লাসে আসবে তখন আপনি ওকে বলবেন, তোমার বন্ধু দুলাল তোমার জন্য গেটে দাঁড়িয়ে আছে। বলবেন তো স্যার? দুলাল দেখতে পায় না বাংলা টিচারের চোখে পানি। তিনি স্কুলের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছেন। তিনি দুলালের দিকে তাকান না। দুলাল অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ■

শেখ রাসেলের ইচ্ছে ঘোড়া

রফিকুর রশীদ

কাঠের ঘোড়া খুঁজে পাবার পর মন ভালো হয়ে গেছে রাসেলের। রমা ভাই নিজে খোঁজাখুঁজি না করলে এই ঘোড়ার নাগাল আজও পাওয়া যেত না। বেশ কদিন ধরে রমাকে এই কাঠের ঘোড়া খুঁজে দেবার কথা বলছে রাসেল। কিন্তু কোথায় সেই ঘোড়া! রমা ভাই তো একা নয়, এ বাড়িতে আরও অনেক কাজের মানুষ আছে, কারও নাকি মনেই পড়ে না সেই বিখ্যাত কাঠের ঘোড়াটির কথা।

কী আশ্চর্য ঘটনা, বঙ্গবন্ধুর হাতের পরশমাখা একটি স্মৃতিচিহ্ন খুঁজেই পাওয়া যাবে না! সেই কাঠের ঘোড়াটি নিয়ে সবাই যখন তটস্থ, তখন শুধু বকুল একবার হাতের কাজ ফেলে রেখে জানতে চায়–
আচ্ছা ভাইজান, ঘুড়াডা কি নকশাকাটা?
রমা ঝটপট জবাব দেয়-
হ, মজাদার নকশাকাটা। তুই কি দেখছস?
বকুল আবার শুধায়,
টাট্টুঘুড়ার লাহান ল্যাজ উঁচা?
হ, হ। তুই দেখছস? রমার চোখে বিস্ময়। কই দেখছস? ক, কই দেখছস?
চুলের বেনি দুই কাঁধে ঠেলে দিয়ে ডান হাতে মাথা চুলকায় বকুল। দাঁতের নিচে ঠোঁট চেপে ধরে খুব চিন্তিত মুখে বলে–
কই য্যান দেখছি, মনে পড়ে না ক্যান, ইস!
ধমকে ওঠে রমা–
যা ছেমড়ি! বুইড়া মানুষের লাহান পাকনা পাকনা কতা! ভালো কইরা খুঁইজা দ্যাখ।

বকুল খুব ব্যস্ত হয়ে সরে যায় সামনে থেকে। এখন এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না বটে, তবু যেন সে খুবই আন্তরিকভাবে সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখতে চায়। কোথায় লুকিয়ে আছে রাসেলের এত সাধের কাঠের ঘোড়া। ছোটো ভাইকে তো সে কম ভালোবাসে না! তার যখন শখ হয়েছে, অনেকদিন পর খেলনা ঘোড়াটি পেতে চাইছে, খুঁজে তো দিতেই হবে!
সেই খোঁজাখুঁজি চলছে তো চলছেই।

কাঠের তৈরি ঘোড়া। এমন অসামান্য বিশাল কিছু নয়। রাসেল সেইবার বাবার সঙ্গে কোথায় যেন গিয়েছিল। বাবা স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। জাতির পিতা। অবশ্য সাধারণ মানুষ বলে, বঙ্গবন্ধু। তিনি যেখানেই যান তাঁর গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় ফুলের মালা। ছোটো ছেলে রাসেল সঙ্গে থাকলে সেও মালা পায়, হাততালি পায়, সঙ্গে দু-একটা উপহারও।

বাবা- মায়ের আদরের সন্তান রাসেল। সবার ছোটো সে। বড়ো ভাইবোন, ভাবি-দুলাভাই সবাই তাকে ভালোবাসে। কারও কাছে কোনো আবদার করলে তা অপূর্ণ থাকেনি কখনো। কতরকম যে খেলনা আছে তার লেখাজোখা নেই। ছোটো সাইজের সাইকেল আছে, তিন চাকার বেবি রিকশা আছে। তবু সেইবার সোনারগাঁ কারুপল্লির মেলা উদ্‌বোধন করতে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রাসেলও যায়। উদ্‌বোধন শেষে মেলার স্টল ঘুরে দেখার সময় রাসেল গিয়ে এক স্টলের ভেতরে কাঠের ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে।

সেটি ছিল চাকাওয়ালা ঘোড়া। পিঠের উপরে সওয়ারি উঠলেই চাকা গড়িয়ে চলতে শুরু করে। হঠাৎ সেই ঘোড়ায় চড়ে রাসেল খুব মজা পায়। স্টলের মালিকও খুব খুশি। আর কারও দোকানে না ঢুকে রাসেল যে তার দোকানে ঢুকেছে, ঘোড়ায় চড়েছে, বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখেছেন, ঘোড়া চলতে শুরু করলে তিনি হাততালি পর্যন্ত দিয়েছেন; আর কী চাই তার! সাংবাদিকেরা ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে বেশ কয়েকটা ছবি তুলেছে তার দোকানের। খুশিতে গদগদ হয়ে সেই কাঠের ঘোড়া রাসেলকে সে উপহার দেয়। বঙ্গবন্ধু ঘোড়ার দাম দিতে গেলে সে বিনয়ে গলে পড়ে, প্রবল আপত্তি জানায়। বঙ্গবন্ধুর পা ছুঁয়ে কদমবুসি করে। দাঁতে জিভ কেটে লজ্জা প্রকাশ করে। অতঃপর হাতজোড় করে ক্ষমা চায় সে। ছোটো ভাইকে দেওয়া উপহারের কোনো দাম সে নিতে পারবে না।

সেই কাঠের ঘোড়া।
মেলা থেকে ঘোড়াটা বাড়ি নিয়ে আসার পর রাসেলের সে কী আনন্দ! সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায় ঘোড়ায় চড়ে। বাড়ির মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে সাধ মেটে না, ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। চলে আসে ধানমন্ডি লেকের ব্রিজের উপরে। কী যে দুরন্তপনা! সেই ঘোড়ার পিছনে আবার ছুটতে হয় রমাকে। রমা ছাড়া অন্য কেউ রাসেলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে বাড়ির কাজ ফেলে রমাকেই ছুটতে হয় রাসেলকে ফেরাবার জন্যে। জয়কে কোলে নিয়ে হাসুবু সামনে এসে দাঁড়ালে আনন্দে আটখানা হয়ে সে প্রস্তাব রাখে–
জয়কে আমার সঙ্গে দাও না, আমার পঙ্খিরাজে চড়িয়ে আনি!
হাসুবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে,
কোথায় তোর পঙ্খিরাজ!

সলজ্জ ভঙ্গিতে তার কাঠের ঘোড়া দেখিয়ে একগাল হেসে বলে,
এই যে আমার পঙ্খিরাজ।
হাসুবু ছোটো ভাইয়ের পিঠে হাত ঠেকিয়ে হেসে বলেন, ভাগনেকে চড়াতে পারবি তো পঙ্খিরাজে?
ভাগনেকে সঙ্গে পেলে তো আমি সাতসমুদ্দুর পাড়ি দিতেও রাজি।
হাসুবু যেন ভয় পেয়ে যায়,
সাতসমুদ্দুর পাড়ি দিবি তুই?
জয়কে তুমি দাও না হাসুবু!
কোলে নিলে সাবধানে নিস। কিন্তু এখনই পঙ্খিরাজে চড়ানোর দরকার নেই। আরেকটু বড়ো হোক, তারপর মামা-ভাগনে যেখানে যাবি যাস।
হাসুবুর এই উত্তরে রাসেলের একটুখানি মন খারাপ হয়ে যায়। তবু সে জোর দিয়ে বলে,
আচ্ছা, বড়ো হোক জয়।
হাসুবু বলে, নেই কোনো ভয়।
ফিক করে হেসে ওঠে রাসেল। তারপর প্রিয় কাঠের ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে যাবার ইচ্ছে যার বুকের ভেতরে টগবগ করে ফোটে, সামান্য কথায় তার মন খারাপ করলে কী চলে! ভাগনে জয়ের গাল টিপে দিয়ে সে মগ্ন হয়ে যায় আপন ভুবনে। কিন্তু রাসেলেরই বা বয়স কত! সেও তো নিতান্ত ছেলেমানুষ, বই নয়! একই জায়গায়, একই জিনিসে কতক্ষণ মনোযোগ থাকে! সবচেয়ে প্রিয় জিনিসও এক সময় তুচ্ছ হয়ে যায় শিশুদের কাছে। রাসেলেরও হয়েছে তাই। কখন হারিয়ে গেছে তার প্রিয় পঙ্খিরাজ! নিচতলার ভাঁড়ার ঘরের কোন অন্ধকার কুঠুরিতে আশ্রয় মিলেছে সেই কাঠের ঘোড়ার, সে কথা কার-ই বা মনে আছে!

অনেকদিন পর খেয়ালি বালক রাসেলের আবার মনে পড়ে যায় প্রিয় পঙ্খিরাজকে, ফেলে আসা সেই কাঠের ঘোড়াকে। কেন এই মনে পড়া? কেন স্মৃতির সমুদ্রে ফের ডুবসাঁতার? রাসেলের প্রিয় রমা ভাইয়ের সারা বাড়ি জুড়ে কেন এই খানাতল্লাশি? এ বাড়ির কাজের মানুষ রমা ভাই, রাসেলের জন্য তার ভালোবাসা কারো চেয়ে কম কিছু নয়। সেই রাসেল তার প্রিয় পঙ্খিরাজকে ফিরে পেতে চাইলে রমা কি স্থির থাকতে পারে! যেখান থেকে হোক, যেভাবেই হোক, সে তা খুঁজে আনবেই। কিন্তু সেই রমার মনেও প্রশ্ন জেগেছে, এমন কেন হলো! পেছনে ফেলে আসা কোনো জিনিস খুঁজে পাবার জন্য এমন আকুল তো হয় না ছোটো ভাই! এই খেয়াল কেন চাপল তার মাথায়?

সে কথা জানা গেল আরো অনেক পরে।

জানা গেল মানে, জোর করে তো জানা যাবে না, সে নিজে থেকে বললে তবেই জানা সম্ভব। শিশুদের কল্পনাশক্তি কত যে প্রখর আর রঙিন হতে পারে, বড়োদের পক্ষে সেটা ভেবে ওঠাই অসম্ভব। বাস্তবের সঙ্গে মিল থাক আর না-ই থাক, শিশুদের কল্পনা চলে আপন গতিতে। ওসব সম্ভব অসম্ভবের ধার ধারে না মোটেই। রাসেলের হয়েছে তা-ই। কবে নাকি ইশকুলে রবীন্দ্রনাথের ছোটোবেলার গল্প শুনিয়েছেন বাংলার ম্যাডাম রাজিয়া আপা। জমিদার পুত্র হয়েও শিশুবেলায় তার অনেক কষ্ট ছিল, দুঃখ ছিল। একদম স্বাধীনতা ছিল না। ইচ্ছে হলেই বাড়ির বাইরে যাওয়া, ইচ্ছেমতো খেলাধুলো করা ঠাকুরবাড়িতে ছিল অসম্ভব। পেটপুরে খাওয়ার ব্যাপারেও কতরকম বাধানিষেধ, ব্রজেশ্বরের বাড়াবাড়ি। বারান্দায় কাঠের ঘোড়া চালাতে চালাতে একদিন রাসেল প্রশ্ন করে,

রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছ রমা ভাই?

রমার হাতে অনেক কাজ। তবু কান খাড়া করে। দু-পা পিছিয়ে এসে জানায়, রবীন্দ্রনাথের নাম সে শুনেছে। তাঁর লেখা কবিতাও পড়েছে দু-চারটি। রাসেলের কাঁধে হাত রেখে বলে, তিনি তো মস্ত বড়ো কবি ছিলেন!
বিরাট সেই কবিরও আমাদের মতো ছোটোবেলা ছিল, জানো?
মজা করার জন্য রমা অবাক হবার ভান করে বলে,
তাই নাকি! রবীন্দ্রনাথেরও ছোটোবেলা ছিল তাহলে!
তবে আর বলছি কী! আমাদের রাজিয়া আপা বলেছেন, ছোটোবেলায় তাঁর নাকি একটা পালকি ছিল।
রবীন্দ্রনাথের পালকি! রমা এবার সত্যিই বিস্মিত হয়, কই আগে কখনো শুনিনি তো!
রাসেল এবার গম্ভীরভাবে বলে,

তুমি আর কী জানো! আপা বলেছেন ছুটির দুপুরে সেই পালকিটাই হতো কবির সঙ্গী। বাস্তবে না হোক, কল্পনায় রবি ঠাকুর সেই পালকিকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াতেন ইচ্ছে মতোন। কত দূরদূরান্তে দেশ-দেশান্তরে মনে মনে ঘুরে বেড়াতেন সেই পালকিতে চড়ে!

এতক্ষণে রমা খুব কায়দামতো কথা পাড়ে,

ঠিক তোমার এই পঙ্খিরাজের মতো, তাই না ছোটো ভাই?

রাসেল খুব খুশি হয়। ঠিক বলেছ। সেটাও ছিল ঠাকুরবাড়ির বাতিল পালকি। আমার এই কাঠের ঘোড়াও তো অচল হয়েই পড়েছিল।

হ্যাঁ, ভাঁড়ার ঘরে বাতিল জিনিসপত্রের মধ্যেই তো ছিল। তাহলে তুমিই বলো তো রমা ভাই, রবীন্দ্রনাথের অচল পালকি যদি সচল হয়, আমার এই কাঠের ঘোড়া কেন সচল হবে না?

রমা একগাল হেসে বলে,

সচল হবে না মানে! পড়েছে কার হাতে দেখতে হবে না!

কাঁধের গামছা দিয়ে কাঠের ঘোড়ার গায়ের ধুলোবালি মুছতে মুছতে রমা বলে,

এই জন্যেই তো এটা এখন পঙ্খিরাজ হয়েছে।

রাসেল খুবই কৃতজ্ঞ। সে বলেই ফেলে,

কিন্তু তুমি যদি কষ্ট করে খুঁজে না দিতে, তাহলে কোথায় পেতাম আমার এই ইচ্ছে ঘোড়া!

আহা তুমি বলেছ, খুঁজে তো পাবই।

তুমি খুব ভালো রমা ভাই।

আমার অনেক কাজ আছে ছোটো ভাই, আমি তাহলে যাই।

আচ্ছা। রাজিয়া আপা আমাদের বাসায় বেড়াতে এলে তখন আমার এই পঙ্খিরাজ তাঁকে দেখাব। ব্যাপারটা কেমন হবে, বলো দেখি!

খুব ভালো হবে। আপাও বুঝবেন। রবীন্দ্রনাথের যেমন পালকি, তোমারও তেমনি ইচ্ছে ঘোড়া। কম কিসে!

রাসেল হা হা করে হেসে ওঠে। পা দুলিয়ে কাঠের ঘোড়া চালাতে চালাতে বলে, তুই আমার পঙ্খিরাজ, তুই-ই আমার ইচ্ছে ঘোড়া। ■

প্রিয় নেতা

তাসনিন আক্তার শিফা

যুগ যুগ ধরে লেখা হবে
শত শত কবিতা
তিনি সংগ্রাম করে এনে দিয়েছেন
আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা।

তিনি হলেন সবার প্রিয়
শেখ মুজিবুর রহমান
ভুলব না কোনোদিন
তাঁর এই অবদান।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, আল হেরা স্কুল অ্যান্ড মাদ্রাসা, কুমিল্লা

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

মাইদুল ইসলাম

বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ
ছিল না তো আগে,
স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে
বঙ্গবন্ধুর ডাকে।

কত শোষিত, অত্যাচারিত
হয়েছি পাকিস্তানিদের হাতে,
হাজার বাঙালি রক্ত দিলো
স্বাধীনতার ডাকে।

বাংলাদেশকে জানতে হলে
বঙ্গবন্ধুকে জানার আছে বেশ,
বঙ্গবন্ধু মানেই তো...
সোনার বাংলাদেশ।

শিশু রাসেল

শশধর চন্দ্র রায়

একটি শিশু জন্মেছিল
মুজিব পরিবারে,
তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি-সাহস
সবার নজর কাড়ে।
সেই শিশুটির মনে ছিল
হরেক স্বপ্ন-আশা,
বুকে ছিল দেশের প্রতি
গভীর ভালোবাসা।
পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট
নিকষ কালো রাতে,
প্রাণ যে গেল সেই শিশুটির
ঘাতক দলের হাতে।
রাসেল নামের সেই শিশুটি
সবার নয়নমনি,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের
ভালোবাসার খনি।

জন্মদিনের আদর

আ.ফ.ম. মোদাচ্ছের আলী

জন্মদিনের শুভক্ষণে
রাসেল তুমি নাই,
বাংলাদেশের বুকের মাঝে
খুঁজে তোমায় পাই।
পাষণ্ডেরা দেয়নি রেহাই
ছোট্ট মানিকটাকে
বেঁচে আছো সোনা তুমি
লাল–সবুজের বাঁকে।
তোমার জন্য অনেক আদর
অচিন দেশের ভূমে,
শুভদিনে স্মরি তোমায়
ভালোবাসার চুমে।

রাসেল সোনা

সাকিব জামাল

আগস্ট এলে, মনটা কাঁদে-
রাসেল সোনার জন্য,
শিশুদের মাঝে, খুঁজি তাঁকে-
হয়ে আমি হন্য।
জানি, সে আসবে না ফিরে-
এই বাংলায় আর,
তবু, মানতে কষ্ট হয় ভীষণ-
নির্মম মৃত্যু তাঁর!
এতটুকু সোনার শিশু
খুন করেছে যারা,
ওরা হায়েনা, ওরা শকুন
মন্দ মানুষ তারা!
বহু বছর পরে, হয়েছি খুশি-
খুনিদের হয়েছে ফাঁসি,
এসো বন্ধুরা, সারাজীবন আমরা-
রাসেলকে ভালোবাসি।

বন্ধু আমার রাসেল

পরিতোষ বাবলু

মুক্তিসেনা আর সাজে না
নেই গোছানো বই
সাইকেলেও বেল বাজে না
রাসেল গেল কই?
এ ঘর খুঁজি, সে ঘর খুঁজি
খুঁজতে গেলাম ছাদে
পাশের বাড়ির ছোট্ট বিড়াল
ক্যামন জানি কাঁদে!
পাড়ার কুকুর সকাল-দুপুর
কান্না করে ডাকে
কই লুকালো বন্ধু রাসেল?
প্রশ্ন করি মা-কে।
মায়ের চোখে জলটা দেখি
মনটা কেন ভারি?
দুষ্টুগুলো আসলো চেপে
জলপাই রং গাড়ি!
বলল বাবা আসবে রাসেল
ঘুমায় যখন পাড়া
রাসেল সোনা ওই আকাশে
একটি ধ্রুবতারা!
আকাশ পানে সন্ধ্যা রাতে
তাই তো চেয়ে থাকি
কোন তারাটি বন্ধু আমার
রাসেল বলে ডাকি?

শেখ রাসেল স্মরণে

নুসরাত জাহান

শেখ রাসেল তুমি আজও বেঁচে আছো
লক্ষ কোটি বাঙালির হৃদয় জুড়ে।
তোমার মাঝেই আমরা খুঁজে পাই
বাঙালির এক রাজপুত্রকে।
তুমি ছিলে বিনয়ের অবতার আর সাদাসিধে
তাই তো তোমার স্মৃতিকে বুকে ধারণ করে
আছে এ দেশের লক্ষ লক্ষ শিশু।
তুমি ছিলে ব্যবহারে, শৈশবের মহানুভবতায় অমায়িক।
তোমার নামটি শুনলেই তাই
আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ি।
আজ এত বছর পরেও তোমাকে
আমরা স্মরণ করি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
তোমাকে আমরা ভুলব না
তুমি আছো, তুমি থাকবে চিরকাল
আমাদের হৃদয়ের গভীরে।

গোলবনের সুন্দরী হাঁস

আ ন ম আমিনুর রহমান

একুশ বছর আগে প্রথম বার যখন সুন্দরবন গেলাম তখন ভাটার সময় গোলবনের কাদাময় এক অচেনা খালের পাড়ে রহস্যময় একটি পাখির দেখা পেয়েছিলাম। এরপর বহুদিন গড়িয়ে গেছে। বহুবার সুন্দরবন গিয়েছি। কিন্তু গোলবনের রহস্যময় পাখিটির দেখা পাইনি কোনোদিন। গত কয়েক বছরে গোলবনের রহস্যময় পাখিটির সন্ধানে সুন্দরবনের জামুলি, সুন্দরি, আন্দারমানিক ও হারবাড়িয়া খালের বেশ গহীনে অভিজ্ঞ মাঝি নিয়ে বেশ কবার গিয়েছি। কিন্তু ওদের কোনো সন্ধান পাইনি। এরচেয়ে দুর্ভাগ্য আর আছে কি?

ছোট্ট বন্ধুরা, সুন্দরবনের সেই রহস্যময় পাখিটিকে কীভাবে খুঁজে পেলাম তার গল্পই আজ তোমাদের বলব। মনোযোগ দিয়ে শোনো:

২০১৮ সালের ২৫শে জানুয়ারি ছেলে নাফিমসহ সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। এবার সঙ্গে ছিল আগেরবারের অভিজ্ঞ মাঝির ছেলে গাউস মাঝি ও 'আলোর কোল' নামের ছোট্ট লঞ্চের সারেং অভিজ্ঞ সগির ভাই। ওরা দুজনেই গোলবনের রহস্যময় পাখিটিকে দেখাবে বলে আমায় কথা দিলো।

২৬শে জানুয়ারি সকাল সাতটায় মংলা থেকে লঞ্চ ছেড়ে সন্ধ্যা নাগাদ কচিখালি পৌঁছলাম, রাতটা লঞ্চে কাটিয়ে পরদিন সকাল সকাল কোশা নৌকায় পাশের ছোটো খালে ঢুকে গেলাম। খালে ঢোকার আগেই দেখা হয়ে গেল এক জোড়া চিত্রা হরিণের সঙ্গে। এরপর একে একে তিন প্রজাতির মাছরাঙা, কুঁড়ো বক, নীলাভকপাল কীটকুড়ানি, ছোটো সহেলি, খোঁপাবাজ ছাড়া অন্য কোনো পাখির দেখা পেলাম না; রহস্যময় পাখি দেখা তো দূরের কথা।

এরপর হলো কি শোনো, বেলা আটটা নাগাদ নৌকা থেকে নেমে আমরা বাঘের বৈঠকখানা নামে বিখ্যাত কচিখালির ঘাসবনে নামলাম। কিছুক্ষণ সাবধানে হাঁটার পর বেশ দূরে একটি বহুরূপী ঈগলকে বসে থাকতে দেখলাম। ওর দিকে ক্যামেরা তাক করে দুটো ক্লিক করতেই সে উড়াল দিলো। কিন্তু আমাকে মোটেও খুশি করতে পারল না। কারণ পাশের মাঠেই দেখলাম একদল দূরন্ত চিত্রা হরিণ

ঘাস খাচ্ছে। লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওরা অত্যন্ত সজাগ। আমাদের উপস্থিতি ঠিকই টের পেয়ে গেল। আর সামনের দিকে দিলো ভোঁ-দৌড়! বুঝলাম, এই না হলে কি ওরা বাঘের চোখ ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকে! যাহোক ওদের দৌড়ের দু-চারটা ছবি তুলেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। উঁচু ঘাসবন বাঘের লুকিয়ে থাকার উপযুক্ত জায়গা বটে, তা না হলে কি বলে বাঘের বৈঠকখানা!

হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম রাজগোখরা সাপের আখড়ায়। কতগুলো তালগাছ-বটগাছ মিলে এ আখড়া। আশ্চর্যের ব্যাপার, সুন্দরবনের লোনা জলের বনে কীভাবে এমন তাল-বটগাছ জন্মালো। সঙ্গে থাকা বনপ্রহরী মাসুদ ভাই বললেন এগুলো বনবিভাগের কাজ। যাহোক অন্যরা রাজগোখরার বাসার দিকে গেলেও আমি উলটো দিকে হাঁটা শুরু করলাম বেশ কিছু পাখির আনাগোনা দেখে। এসব পাখির মধ্যে ছিল সরগম, নীলরানি, দোয়েল, কাদাখোঁচা, বুলবুলি ও সাদা খঞ্জনসহ আরো কয়েকটি প্রজাতি। গোখরার দেখা না পেয়ে ওরাও খানিকক্ষণ পর আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো। হাতে সময় কম থাকায় বাঘের বৈঠকখানা ছেড়ে নৌকার দিকে পা বাড়ালাম।

কচিখালি বন অফিসের কাছাকাছি আসতেই এক পাল শুকরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের ছবি তুলতে ব্যস্ত হতে না হতেই ছোট্ট একটি পাখির দেখা পেয়ে গেলাম। বেশ কিছু ছবি তোলার পরও পাখিটিকে ধারণ করতে পারলাম না। অবশ্য পরবর্তীতে ঢাকায় এসে ওর ছবি ঠিকই ধারণ করলাম নীলগলা নীল চটক হিসেবে। যাহোক, কচিখালি থেকে নৌকায় ওঠার আগে আরেকটি দুর্লভ পাখি বনখঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। যদিও এ সময় ওকে এখানে দেখা পাওয়ার কথা নয়। কয়েকটা ক্লিক করে দ্রুত নৌকার পথে পা বাড়ালাম।

'কি, গল্প বেশি লম্বা হয়ে গেল? বুঝতে পারছি তোমাদের আর তর সইছে না। আর একটু অপেক্ষা করো।'

তো যা বলছিলাম। নয়টা নাগাদ লঞ্চে ফিরে সকালের নাশতা সারলাম। এরপর বাঘের বাড়ি কটকার পথে রওয়ানা হলাম। তবে বড়ো কটকা খাল দিয়ে না গিয়ে ছোটো কটকা খাল দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। ভাটা চলছে। সগির সারেং ও গাউস মাঝি বলল, এখানেই রহস্যময় পাখিটির দেখা মিলতে পারে। কাজেই ক্যামেরা হাতে আমরা সাতজন টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দৃষ্টি সবার গোলবনের পলিময় কাদার দিকে। কিন্তু এভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা হয়ে গেল। কাজেই পরিশ্রান্ত হয়ে সবাই যেন কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হয়ে গেল। তবে আমার দৃষ্টি কিন্তু গোলবনের কাদার দিকেই থাকল।

এভাবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাইকন ডি-৫০০ ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে হাঁসের মতো একটি পাখির চেহারা ভেসে ওঠল। কিন্তু ওর ঠোঁটটি তো হাঁসের মতো নয়, বরং চোখা। পায়ের পাতাও কেমন যেন অন্যরকম, এগুলো তো পায়ের আঙুলের সঙ্গে যুক্ত নয়! বিচিত্র ধরনের পাখিই তো এটি!

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম! আর আমার ডান হাতের আঙুল অজান্তেই ক্যামেরা ক্লিক করে গেল। খুশির চোটে হঠাৎ-ই বলে উঠলাম, 'হাঁসপাখি! হাঁসপাখি!' পাখিটি দ্রুত গোলগাছপূর্ণ গোলবনের কাদাময় পাড় থেকে পানিতে নেমে গেল। আমি ও বিটু ছাড়া আর কেউ ওর ছবি তুলতে পারল না। রহস্যময় পাখিটির আবিষ্কারে মনপ্রাণ আনন্দে ভরে উঠল।

খানিক পর কোসা নৌকা নিয়ে বের হলাম এবং আবারো ওকে দেখলাম। এবার সবাই ছবি তুলতে পারল। আমার ছেলে নাফিম তো ওর ভিডিও-ই করে ফেলল। ছোটো কটকা খালে ওইদিন তিনটি হাঁসপাখির দেখা পেলাম। অবশ্য সবগুলোই ছিল ছেলে পাখি। কোনো মেয়ে বা বাচ্চা পাখির দেখা পেলাম না। পরদিন ভোরে সুন্দরী খালে দেখা হলো আরো চারটি পাখির সঙ্গে। এর মধ্যে তিনটি ছিল ছেলে ও মাত্র একটি মেয়ে পাখি। তবে সবাই ছিল একা একা। একসঙ্গে কখনোই দুটি পাখির দেখা পাইনি। ভাবতেই অবাক লাগছে এত বছরেও যে পাখির দেখা পাইনি, মাত্র দু-দিনে ওদের সাত সাতটি আলাদা পাখির দেখা মিলল!

ছোট্ট বন্ধুরা, গোলবনের রহস্যময় সুন্দরী এই হাঁসপাখি আর কেউ নয়, এদেশের বিরল ও বিপন্ন বিচিত্র এক পাখি সুন্দরী বা গোইলো হাঁস। অন্তত সুন্দরবনের জেলে-বাওয়ালি-মৌয়াল-জোংরা খোটাদের কাছে ওরা এই নামেই পরিচিত। অবশ্য অনেকে এদেরকে গোলবনের হাঁসপাখি বা বাইলা হাঁসপাখি নামেও ডাকে। তবে নাম হাঁসপাখি হলেও প্রকৃতপক্ষে হংস বা Anatidae পরিবারের ধারেকাছের পাখিও নয় এটি। বরং জলমুরগি, যেমন রাঙা হালতি, ডুংকর, ডাহুক, কোড়া, কালেম ও সারস ক্রেন পাখিদের নিকটাত্মীয় এটি। কেউ কেউ ওর কেতাবি নাম দিয়েছে 'মুখোশপড়া জলার পাখি' বা 'কালামুখ প্যারাপাখি'। কিন্তু যেখানে ওর ইংরেজি নাম Masked finfoot, তাই বাংলা নাম দিতে হলে আমার মতে হওয়া উচিত 'মুখোশি পাখনা-পা'। তবে এ নামটি মোটেও সুন্দর হলো না। ওর আরেকটি ইংরেজি নাম হলো Asian Finfoot। কাজেই সুন্দরবনের খেটে খাওয়া মানুষের কাছে যেহেতু পাখিটি সুন্দরী বা গোইলো হাঁস অথবা গোলবনের হাঁসপাখি বা বাইলা হাঁসপাখি নামে পরিচিত, তাই এ নামগুলোই থাকা উচিত। যাহোক, Helornithidae (হেলিওরনিথিডি) বা জলাস্টুলিক গোত্রের পাখিটির বৈজ্ঞানিক নাম Heliopais personata (হেলিওপাইস পারসোন্যাটা)।

ছোট্টমনিরা, একটি কথা জেনে রেখো এই গোত্রের পাখিগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দেখতে অনেকটা হাঁসের মতো হলেও জলচর এই পাখিগুলো কিন্তু হাঁসের দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও নয়। ওদের গলা বেশ লম্বা ও পুরু এবং লেজ শক্ত ও মাঝারি আকারের। ঠোঁট বেশ বড়ো ও হাঁসের মতো উপর-নিচে চ্যাপটা না হয়ে বরং দুপাশ থেকে কিছুটা চ্যাপটা যার আগা বেশ চোখা। পায়ের আঙুল হাঁসের মতোই, তবে তা পায়ের পাতার সঙ্গে যুক্ত নয় এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল রঙের ও দেখতে কতকটা মাছের পাখনার মতো। ওরা সাঁতার কাটা, ডুব দেওয়া ও দৌড়াতে পারদর্শী কিন্তু খুব একটা উড়ে না। বিশ্বব্যাপী মাত্র তিনটি প্রজাতি নিয়ে গঠিত এই গোত্রের অন্য দুটি প্রজাতির নাম যথাক্রমে African finfoot ও Sungrebe।

ঠোঁটের আগা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত পাখিটির দৈর্ঘ্য ৫৬ সে.মি.। এক নজরে পাখিটির দেহের পালক গাঢ় বাদামি। লম্বা গলাটি হালকা বাদামি। পিঠ জলপাই-বাদামি। ডানার প্রাথমিক পালক কালচে জলপাই-বাদামি। বুক-পেট-লেজতল হালকা বাদামি। চোখের পিছন থেকে ঘাড়ের পার্শ্বদিক পর্যন্ত সাদা ডোরা রয়েছে। লম্বা চোখা ড্যাগারের মতো হলুদ ঠোঁটটি কিন্তু মোটেও হাঁসের মতো চ্যাপটা নয়। পায়ের আঙুলে পর্দা থাকলেও তা হাঁসের মতো পায়ের পাতায় যুক্ত থাকে না। বরং এটি দেখতে অনেকটা মাছের পাখনার মতো। পায়ের রং সবুজাভ-হলুদ। ছেলে ও মেয়ে পাখির চেহারায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ছেলে পাখির ঘাড়, গলার সম্মুখভাগ ও চিবুক কালো, মেয়ে পাখিটির ক্ষেত্রে যা সাদা। ছেলের চোখ গাঢ় বাদামি ও ঠোঁটের গোড়ায় শিং জাতীয় পদার্থ থাকে।

অন্যদিকে, মেয়েটির চোখ হলুদ ও ঠোঁটের গোড়ায় শিং থাকে না। অপ্রাপ্তবয়স্ক পাখির কপালের ধূসর ও ঠোঁটের ক্রিম-হলুদ রং ছাড়া বাকি সবই দেখতে মেয়ে পাখির মতো।

আগেই বলেছি সুন্দরী হাঁস বিরল আবাসিক পাখি, বর্তমানে বিপন্ন। এটিকে শুধু সুন্দরবনেই দেখা যায়। বাংলাদেশ ছাড়াও ওরা ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ায় বাস করে। অন্যান্য দেশে লোনা ও মিঠাপানির নদী বা জলাশয়ে দেখা গেলেও এদেশে লোনা জলের সুন্দরবন ছাড়া অন্য কোথাও দেখার তথ্য নেই। অতি লাজুক পাখিটি একাকী, জোড়ায় বা ছোটো পারিবারিক দলে বিচরণ করে। অল্প পানিতে সাঁতার কেটে বা কাদায় হেঁটে চিংড়ি, ছোটো মাছ, কাঁকড়া, ব্যাঙাচি, শামুক, জলজ কীটপতঙ্গ ইত্যাদি খায়। ভয় পেলে বা বিপদ দেখলে ঠোঁটসহ মাথা পানিতে ভাসিয়ে ডুবে থাকে বা দ্রুত দৌড়ে গোলবনের গভীরে পালিয়ে যায়। তবে এরা হাঁসের মতোই উচ্চস্বরে 'প্যাক প্যাক...' শব্দে ডাকে।

জুলাই থেকে আগস্ট এদের প্রজননকাল। এ সময় মাটি বা পানি থেকে ১-৩ মিটার উপরে গাছের বড়ো শাখায় ঘন পাতার আড়ালে কাঠিকুটি ও শিকড়-বাকড় দিয়ে স্তূপের মতো গোলাকার বাসা বানায়। ডিম পাড়ে ৪-৮টি। ওদের ডিমগুলো হয় লম্বাটে। ডিমের রং ধূসর সাদা যার উপর থাকে গাঢ় ছিটাফোঁটা। সদ্য ফোটা ছানার কোমল পালকের রং ধূসর ও ঠোঁটের উপর সাদা ফোটা থাকে। ওরা দশ বছরের বেশি বাঁচতে পারে।

ছোট্ট মনিরা, একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা জেনে রাখো। বিপন্ন এই পাখিটির সংখ্যা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। সারাবিশ্বে বর্তমানে মাত্র ৬০০ থেকে ১,৭০০টি পাখি রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন। কাজেই গোলবনের বিরল ও বিপন্ন রহস্যময় সুন্দরী হাঁস রক্ষার জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। ■

প্রাণীর উৎপাত

মোহা. রাকিবুল ইসলাম

তিড়িং বিড়িং ফড়িং নাচে
সুবাস ঘ্রাণে মৌ
ইঁদুর বাবার নাচন দেখে
কাঁদে ঘরের বৌ।
বিড়াল বাবু সত্যি কাবু
বড্ড অভিমান
বানর চড়ে হাতির পিঠে
মলছে হাতির কান।
শিয়াল ব্যাটা সুযোগ পেয়ে
ধরে মুরগির ঠ্যাং
নাক ডেকে ঐ ঘুমে বিভোর
বলদ বেটা ব্যাঙ।
সিংহ বলে আমি রাজা
বাজায় তিলক ঢোল
বাঘ মামা তাই ক্ষেপে উঠে
ছাড়ে মুখের বোল।

সারাবেলা

আইরিন আক্তার

মাঠে ভরা রোদের খেলা
গাছে গাছে ফল-ফুল
এমন দিনে ঘরে থেকে
করব না যে ভুল।
নদীর জলে ঝাঁকে ঝাঁকে
মাছেরা করছে খেলা
দলবেধে মাছ ধরব
কাটিয়ে দিবো সারাবেলা।

৭ম শ্রেণি, ফুলকলি স্কুল, কাঁচপুর, ঢাকা

এলিয়েনদের এক্সপেরিমেন্ট

আশরাফ পিন্টু

–দেখেছ, এ গ্রহটির মানুষগুলো কি আরামপ্রিয়। ওরা দিনে কাজ করে আর রাতে ঘুমায়।

: তুমি এ জায়গা পরিদর্শন করেও ভালো করে ব্যাপারটা লক্ষ করোনি; ওরা আসলে দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করে, বাকি সময় আড্ডা দেয়, এরপর রাতে ঘুমায়।

–হ্যাঁ ঠিক বলেছ।

: এই ৮ ঘণ্টার মধ্যে ওরা কিন্তু অনেকেই আবার কাজে ফাঁকি দেয়– বিশেষ করে অফিস-আদালতে...

–তবে ওদের শ্রমিকেরা ভয়ানক কষ্ট করে, সে অনুয়ায়ী ওদের পারিশ্রমিকও কম।

: হ্যাঁ। এখন কাজের কথা বলো– আমাদের এক্সপেরিমেন্টের কথা।

–দিনরাত ৩০ ঘণ্টার মধ্যে আমরা মাত্র ৩/৪ ঘণ্টা ঘুমাই। এতে আমরা অনেক উন্নতি সাধন করেছি। কিন্তু আমরা ওদের মতো একসঙ্গে কাজ করি না। আমরা মনে করছি গ্রহের সবাই যদি একসঙ্গে কাজ করি এবং একসঙ্গে ঘুমাই তবে অনেক উন্নতি সাধন করতে পারব।

: তাহলে আমরা এই এক্সপেরিমেন্টটাই চালাতে চাচ্ছি পৃথিবীতে।

–হ্যাঁ।

: কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এই গবেষণার জন্য আমরা পৃথিবীর মতো একটি গ্রহকে কেন বেছে নিলাম।

–বুঝতে পারোনি, যখন কোনো এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয় তখন ছোটোখাটো জিনিসই বেছে নেওয়া হয়। পৃথিবীর মানুষও কিন্তু সরাসরি চাঁদে যায়নি। ওরা আগে এক্সপেরিমেন্ট করেছিল কুকুর ও বানর পাঠিয়ে; তারপর নিজেরা গিয়েছিল চাঁদে। সবাই নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এমনটিই করে থাকে।

: তুমি বলছ আমাদের এক্সপেরিমেন্টের জন্য পৃথিবীই একমাত্র উপযুক্ত গ্রহ।

–হয়ত আরো অনেক গ্রহ আছে তবে এটি আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী একটি গ্রহ তাই...।

: বুঝেছি, তাহলে এবার শুরু করা যাক।

–শুরু করার আগে তোমাকে ব্যাপারটা আরেকটু খোলাসা করে বলি: আমি লক্ষ করেছি, পৃথিবীর মানুষ সব কাজ সেরে একসঙ্গে ঘুমায় না; ওরা ২৪ ঘণ্টায় কেউ ঘুমায় আবার কেউ জেগে থাকে।

: এ ব্যাপারটা তো জানিই, ওরা আমাদের মতোই...

–আগে ভালো করে শুনে নাও কথাটা। আমেরিকার লোকেরা যখন কাজে ব্যস্ত থাকে তখন বাংলাদেশে রাত হবার কারণে ওরা ঘুমিয়ে থাকে।

: বুঝেছি, ওরা আসলে ২৪ ঘণ্টাই পৃথিবীকে সচল রাখে।

–হ্যাঁ।

: আর কথা না বাড়িয়ে এক্সপেরিমেন্টের কাজ শুরু করা যাক।

–হ্যাঁ।

কথোপকথন শেষে ভিনগ্রহ থেকে আগত দুই এলিয়েন বিজ্ঞানীর মধ্যে প্রথমজন একটি ছোটো সিলিন্ডারের মতো যন্ত্র থেকে বাতাসের মধ্যে এক প্রকারের গ্যাস ছেড়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সে গ্যাস মিশে যেতে থাকে।

দুই

সিজান ঘুম থেকে উঠে পেপারে চোখ বুলাতেই একটি সংবাদ শিরোনাম দেখেই চমকে ওঠে–

'পৃথিবীর মানুষ এক অজানা রোগে আক্রান্ত'

পৃথিবীর সকল মানুষ বায়ুবাহিত এক অজানা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এ রোগের কারণে তারা ১২ ঘণ্টা ঘুমাচ্ছে এবং ১২ ঘণ্টা জেগে আছে; এর এতটুকু হেরফের হচ্ছে না। তারা অফিসে ৮ ঘণ্টা কাজ করলেও বাকি ৪ ঘণ্টা শেষে ঘুমিয়ে পড়ে; আর এ কাজটা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই হয়ে থাকে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো– এমন ঘটনা নাকি পৃথিবীর সব দেশেই একসঙ্গে ঘটছে। যেমন বাংলাদেশে যখন সকাল ৯টা আমেরিকায় তখন রাত ১০টা। ১০টার সময় মানুষ ঘুমাতে যাবে বা ঘুমিয়ে পড়বে এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়; কিন্তু সকাল ৯টায় যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়ে এবং রাত ৯টায় ঘুম ভাঙে তখনই ঘটে বিপত্তি। আর বাংলাদেশ এবং তার আশেপাশের দেশগুলোতে এমনি বিপত্তি ঘটেছে। তারা অফিসে এসে সবাই ৯টায় ঘুমিয়ে পড়ছে এবং রাত ৯টার আগে কারোই ঘুম ভাঙছে না বা কাউকে জাগানো যাচ্ছে না। এতে বাংলাদেশ ও তার আশেপাশের দেশগুলোর অফিসিয়াল কাজকর্মসহ সব ধরনের কাজকর্মের চরম বিঘ্ন ঘটছে। দেশগুলোর সরকার দু-এক দিনের মধ্যেই অফিস-সময়সূচি রাত ৯টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত করার পরিকল্পনা করছে। এ রকম...

সিজান সংবাদটি পড়ে হতভম্ব হয়ে যায়। ব্যাপারটি হয়ত দু-এক দিন হলো শুরু হয়েছে তাই ও খেয়ালই করেনি। ও তো অফিস থেকে একটু আগেভাগেই ফিরছিল। ঘুমও এসেছিল একটু আগেভাগে। হ্যাঁ রাত ৯টায় ও শুয়েছিল, এর আগে তো ও ঘুমাতে যায় না? ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে সকাল ৯:১০টা বাজে। এতক্ষণ ও তো ঘুমায় না? তাহলে ও ১২ ঘণ্টা একনাগাড়ে ঘুমিয়েছিল? এমন তো কখনো হয়নি! এর কারণ কী? নিউজটার সত্যতা মনে হচ্ছে হাতেনাতে পাচ্ছে ও।

সিজান তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে অফিসে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে।

তিন

সিজান অফিসের ভিতরে ঢুকে দেখে সকলেই কেমন যেন চিন্তিত। অজানা রোগের এই আতঙ্ক নিয়ে কেউ কেউ কথাও বলছে। সহকর্মী এবং বন্ধু টমাস কম্পিউটার মনিটরের স্ক্রিনে মনোযোগ দিয়ে কী যেন পড়ছিল। সিজান তার পাশে দাঁড়িয়ে বলে, কী পড়ছ এত মন দিয়ে?

সিজানের কথার কোনো জবাব না দিয়ে টমাস ওকে পাশের চেয়ারটায় বসার ইঙ্গিত করে। সিজান পাশের চেয়ারে বসে বলে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর?

–হ্যাঁ, লেটেস্ট নিউজ।

–কী রকম?

–বায়ুবাহিত এই অজানা রোগের কারণে সারা পৃথিবী কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে সবকিছু।

–যেমন...

–পড়ে দেখো।

সিজান টমাসের মনিটরের দিকে তাকিয়ে পড়ায় মনোযোগী হয় :

পৃথিবীর সকল মানুষ একযোগে কাজকর্ম করার ফলে একই সময়ে সকলে যোগাযোগ করতে পারছে...

মনিটর থেকে চোখ তুলে টমাসের দিকে তাকিয়ে সিজান বলে, এটা তো ভালো কথা।

–আগে ভালো করে পুরোটা পড়ে দেখো তারপর মন্তব্য করো।

টমাসের কথায় সিজান আবার মনিটরে চোখ রাখে :

তবে ভালোর চেয়ে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াই বেশি পড়ছে পৃথিবীতে। রাতে ঘুমাতে অভ্যস্ত মানুষগুলো রাতের বেলা অফিসিয়াল কাজকর্মগুলো ঠিকমতো করতে পারছে না। আবার দিনে ঘুমানোর ফলে শরীরও ঠিকমতো চলছে না। শরীরে দেখা দিচ্ছে নানা উপসর্গ। তাদের রক্তচাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্মরণশক্তি কমে যাচ্ছে। এর চেয়ে বড়ো কথা– একই সঙ্গে সবকিছুর চাপ পড়ার ফলে বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল, গ্যাস ইত্যাদির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিদ্যুতের অভাবে অনেক দেশে কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় কম্পিউটার মনিটর কালো হয়ে যায়। চারিদিকে অন্ধকারে ছেয়ে যায়। সিজানের

পড়ায় বিঘ্ন ঘটে। সিজান বলে, বোঝা গেছে, আমাদের আমেরিকাতেও এর প্রভাব পড়া শুরু হয়েছে।

–আমেরিকা কি পৃথিবীর বাইরে? কিন্তু এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

–একটা উপায় হবেই। কিন্তু এখনো চার্জ লাইট জ্বলছে না কেন?

–ওটাও হয়ত বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। মোম জ্বালাও।

টমাসের কথায় সিজান ড্রয়ার থেকে একটা মোম বের করে জ্বালায়। আলো জ্বালানোর পর টমাস বলে, কী হতে পারে ব্যাপারটা, এটা ভেবে দেখেছ?

–এটা কোনো 'বিপদ' হবে হয়ত।

–সেটা আবার কী?

–তা একমাত্র উপরওয়ালাই জানেন।

–একটা বিজ্ঞানসম্মত কথা বলো?

–আমাদের ডাক্তার, বিজ্ঞানীরা তো ইতোমধ্যেই গবেষণায় লেগে গেছেন, দেখা যাক কী হয়।

–তবে প্রকৃতিরও একটা নিজস্ব নিয়ম আছে, এর ব্যত্যয় ঘটলে তা প্রকৃতিও সহ্য করবে না। আর মানুষ তো প্রকৃতিরই সন্তান; তাকে রক্ষা করার দায়িত্বও তার।

–ঠিক বলেছ।

চার

–আমাদের এক্সপেরিমেন্টটা তেমন ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

: হ্যাঁ। দেখছ পৃথিবী কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে পড়ছে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া।

–এই পদ্ধতি আমাদের মধ্যে প্রয়োগ করলে আমাদেরও তেমন কোনো উন্নতি হবে না। এখন কী করা যায়?

: এই পদ্ধতি বাতিল করে অন্য পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

–কী সেটা?

: মানুষের চোখ থেকে একেবারে ঘুম উঠিয়ে দেওয়া। তাহলে বেশি বেশি কাজ করবে; ফলে উন্নতিও বেশি হবে।

–তুমি একজন বিজ্ঞানী হয়ে কী করে এমন কথা বলছ?

: কেন?

–জীব মাত্রই ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে– তা কম হোক আর বেশি হোক। এমনকি যন্ত্রেরও বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। কোনো যন্ত্র যদি একনাগাড়ে কাজ করে যায় তবে তা গরম হয়ে বিকল হয়ে পড়ে অর্থাৎ তার মৃত্যু ঘটে। কোনো জীবই না ঘুমিয়ে একনাগাড়ে কাজ করতে পারবে না।

তাহলে এখন কী করা যায়?

–আমরা যেটুকু এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে ওদের ক্ষতি করেছি এর চেয়ে আর নয়। আমরা ওদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান এবং উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী। আমরা কারো ক্ষতি করতে আসিনি।

: তাহলে আমরা এখন কী করব?

–আমরা আরেকটা গ্যাসীয় ঔষধ বাতাসে ছেড়ে দিয়ে পূর্বের গ্যাসীয় ঔষধের গুণাগুণ নষ্ট করে দেবো। তাহলে পৃথিবীর মানুষ আবার পূর্বের মতো স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবে।

: এরপর?

–এরপর আমাদের আর কোনো কাজ নেই। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো।

প্রথম এলিয়েন কথা শেষ করে সসার থেকে আরেকটা ছোটো সিলিন্ডারের মতো যন্ত্র নিয়ে আসে। তা থেকে এক প্রকারের গ্যাসীয় ঔষধ বাতাসে ছেড়ে দেয়। গ্যাসগুলো দ্রুতগতিতে বাতাসের মধ্যে মিশে যেতে থাকে। কাজ শেষে ওরা সসারে চড়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীগুলো চলে যাবার পর পৃথিবীর মানুষ পূর্বের মতো আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে থাকে। পৃথিবীর মানুষের কাছে ঘটনাটি স্বপ্নের মতো মনে হয়। কেউ বুঝতে পারে না কদিনের জন্য ওদের মধ্যে কেন এমন পরিবর্তন ঘটেছিল। ডাক্তার, বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেও কিছু আবিষ্কার করতে পারেন না। পূর্বেও পৃথিবীতে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে; তারা এটাকেও একটা 'সমস্যা' হিসেবে মনে করে। ■

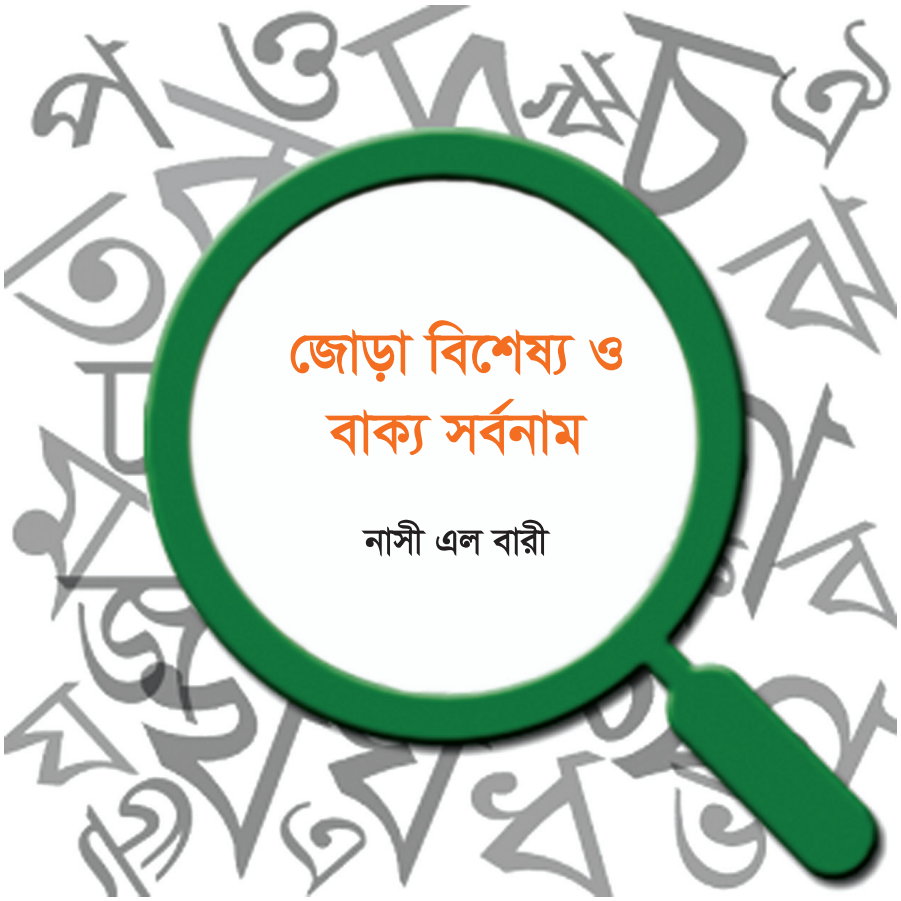

জোড়া বিশেষ্য ও বাক্য সর্বনাম

নাসী এল বারী

‘গরুর খাঁটি দুধ বিক্রি হয়’, খাঁটি গরুর দুধ বিক্রি হয়।’ বাক্য দুইটির মধ্যে কোনটি শুদ্ধ? আমরা যে শুধু দুধের বেলাতেই এমন দ্বিধান্বিত বাক্যযুগল ব্যবহার করি; তা কিন্তু নয়। স্বাভাবিক জীবনে এমন আরো অনেক বাক্য ব্যবহার করি। যেমন- ‘বগুড়ার আসল দই পাওয়া যায়’, ‘আসল বগুড়ার দই পাওয়া যায়’, ‘গরু-ছাগলের বিরাট হাট’, ‘বিরাট গরু-ছাগলের হাট’ ইত্যাদি। এখানে উল্লিখিত প্রথম উদাহরণ আর পরবর্তী উদাহরণ একই ধারার।

উপরের অনুচ্ছেদটি ভালো করে লক্ষ্য করি। জোড়া বিশেষ্য ও বাক্য সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে তাতে। কী বুঝা যাচ্ছে না? আমরা বিশ্লেষণে আসি, তবেই স্পষ্ট হবে।

আগে জোড়া বিশেষ্য নিয়ে বলি। প্রথম উদাহরণে দুধের পরিচিতি ও গুণাগুণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ‘গরুর খাঁটি দুধ বিক্রি হয়’, খাঁটি গরুর দুধ বিক্রি হয়।’ প্রশ্ন করেছিলাম কোন বাক্যটি শুদ্ধ? দুটি বাক্যই শুদ্ধ। ব্যবহারগত দিক থেকে শুধু বিশেষ্য পদের ব্যবহার ভিন্ন। প্রথম বাক্য ‘গরুর খাঁটি দুধ’- এখানে ‘গরুর’ বিশেষণ এবং ‘খাঁটি দুধ’ বিশেষ্য। ‘খাঁটি দুধ’ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুইটি পদ। ‘খাঁটি’ বিশেষণ ‘দুধ’ বিশেষ্য । কিন্তু এখানে আগে ‘গরুর’ পদটি থাকায় ‘খাঁটি দুধ’ একসাথে একটি বিশেষ্য হিসেবে ভাব প্রকাশ করেছে; তাই এটি জোড়া বিশেষ্য। ‘গরুর’ পদটি এখানে বিশেষণ; আরো বিস্তারিত বললে ‘উপাদানবাচক’ বিশেষণ। তেমনি ‘বগুড়ার আসল দই’- এখানে ‘আসল দই’ জোড়া বিশেষ্য; ‘বগুড়ার’-

'উপাদানবাচক' বিশেষণ। 'গরু-ছাগলের বিরাট হাট'- এখানে 'বিরাট হাট' জোড়া বিশেষ্য; 'গরু-ছাগলের'- 'উপাদানবাচক' বিশেষণ। এই তিনটি বাক্যেই পূর্ণভাব প্রকাশ করে। তাই এ বাক্যগুলো শুদ্ধবাক্য।

দ্বিতীয় বাক্য 'খাঁটি গরুর দুধ'- এখানে 'খাঁটি' বিশেষণ আর 'গরুর দুধ' জোড়া বিশেষ্য। তবে 'খাঁটি' পদটি কিন্তু উপাদানবাচক বিশেষণ নয়- 'বৈশিষ্ট্যবাচক বিশেষণ'। তেমনি 'আসল বগুড়ার দই'- এ 'বগুড়ার দই' জোড়া বিশেষ্য; 'আসল' 'বৈশিষ্ট্যবাচক বিশেষণ'। 'বিরাট গরু-ছাগলের হাট'- এ 'গরু-ছাগলের হাট' জোড়া বিশেষ্য; 'বিরাট' 'বৈশিষ্ট্যবাচক বিশেষণ'। এই তিনটি বাক্যও পূর্ণভাব প্রকাশ করে। তাই এ বাক্যগুলোও শুদ্ধবাক্য।

আমরা যদি এই জোড়া বিশেষ্যকে আলাদা করে একক ভাব হিসেবে বিবেচনা করি, তখন অর্থবোধ যথাযথ থাকে না। যেমন- 'খাঁটি গরুর দুধ'। একক ভাব ধরে অর্থ করলে হবে- গরুটা খাঁটি এবং তার দুধ। বাস্তবে গরু খাঁটি কিংবা ভেজাল বলে কি কিছু আছে? তেমনি 'আসল বগুড়ার দই'- এ বাক্যও একক ভাব ধরে অর্থ করলে হবে- আসল বগুড়া এবং তার দই। এখানেও বাস্তবে আসল বা নকল বগুড়া বলে কিছু আছে কি? 'বিরাট গরু-ছাগলের হাট'–একক ভাব ধরে অর্থ করলে হবে-–বড়ো গরু-ছাগল এবং সেসবের হাট। ছোটো গরু-ছাগল নয়। বাস্তবে হাটে কি সব বড়ো বড়ো পশুই থাকে? না, সেখানে ছোটো-বড়ো সব ধরনের পশুই থাকে। এর মানে হলো এ জাতীয় বাক্যে পাঠককে জোড়া বিশেষ্যই ভাবতে হবে; এককভাবে অর্থ করার সুযোগ নেই।

এমন একক অর্থবোধে বাক্য তার গাঠনিক যোগ্যতা হারায়। বাক্যের যোগ্যতা না থাকা মানেই সেটা বাক্য নয়। তাই একক অর্থবোধে বাক্য হয় না বা অশুদ্ধ। তবে কৌতুকচ্ছলে বা আড্ডায় আনন্দ করতে এমন অর্থবোধ করে থাকি- তা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী আনন্দ। সাহিত্যে বা ব্যবহারিকভাবে একক অর্থবোধে এমন বাক্য ব্যবহার হয় না।

এবার বাক্য সর্বনাম প্রসঙ্গে। প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটা ছিল- 'এখানে উল্লিখিত প্রথম উদাহরণ আর পরবর্তী উদাহরণ একই ধারার।' বাক্যটি একটু খেয়াল করি। এ বাক্যে 'প্রথম' আর 'পরবর্তী' বলতে কী বুঝানো হয়েছে? এখানে 'প্রথম' বলতে 'গরুর খাঁটি দুধ বিক্রি হয়', খাঁটি গরুর দুধ বিক্রি হয়।'- এই পুরো অংশকে বুঝানো হয়েছে। আর 'পরবর্তী' বলতে 'বগুড়ার আসল দই পাওয়া যায়', 'আসল বগুড়ার দই পাওয়া যায়', 'গরু-ছাগলের বিরাট হাট', 'বিরাট গরু-ছাগলের হাট'- এই চারটি বাক্যকেই বুঝানো হয়েছে।

সর্বনাম পদ বলতে আমরা জেনে এসেছি 'বিশেষ্যর পরিবর্তে ব্যবহৃত পদ'। এ জানাটা সঠিক- তবে পূর্ণাঙ্গ নয়। শুধু 'বিশেষ্যের পরিবর্তে' বললে অব্যাপ্তিদোষ ঘটে। সর্বনামের ব্যাপকতা অনেক। শুধু নামপদ বা বিশেষ্য পদই নয় বাক্যাংশ, বাক্য বা একাধিক বাক্যের পরিবর্তে যে একক পদ বসে; সেটাও সর্বনাম পদ। এখানে দেওয়া উদাহরণও তেমন। দুইটি বাক্যের পরিবর্তে 'প্রথম' পদটি বসেছে। তাই 'প্রথম' পদটি বাক্য সর্বনাম। 'পরবর্তী' পদটি চারটি বাক্যের পরিবর্তে বসেছে। 'পরবর্তী' পদটিও বাক্য সর্বনাম।

'বগুড়ার আসল দই; যা খেতে খুবই সুস্বাদু।' এটি একটি বাক্যের উদাহরণ। এ বাক্যে ব্যবহৃত 'যা' এই বাক্যেরই 'বগুড়ার আসল দই' অংশের পরিবর্তে বসেছে। 'যা' এখানে সর্বনাম। এটা বাক্যাংশের পরিবর্তে বসেছে; তাই এটা 'বাক্যাংশ সর্বনাম'।

মানুষ কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে। প্রথম অনুচ্ছেদের উদাহরণে প্রকাশিত সব ধরনের বাক্যই আমাদের সাধারণ প্রকাশ মাত্র। ব্যাকরণের বিশ্লেষণে দেখা গেল সবই সঠিক ও যথার্থ। এর মানেই হলো ভাব প্রকাশ মানুষের মৌলিক সত্তা। ভাব প্রকাশে ব্যাকরণের প্রয়োজন নেই। তবে এই কথাকে সভ্যতায় স্থায়ী আসন দিতে হলে লিখিত রূপ থাকতে হবে। লিখিত রূপের জন্য ব্যাকরণের ছাঁচে ফেলে ভাবের শুদ্ধতা ও শৈলীরূপ দিতে হয় মাত্র। ■

মুক্তিযোদ্ধাদের স্কুল

মো. নুরন্নবী খন্দকার

ধানুয়া কামালপুর কো-অপারেটিভ উচ্চ বিদ্যালয়কে মুক্তিযোদ্ধাদের স্কুল বললে ভুল হবে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্কুলটি অনন্য ভূমিকা রেখেছে। জামালপুর জেলার পূর্ব-উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা থানার লাগোয়া ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়ন। বকশীগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে ১১ কি.মি. দূরে মুক্তিযুদ্ধের নিরন্তর সাক্ষী ধানুয়া কামালপুর কো-অপারেটিভ উচ্চ বিদ্যালয়টি।

সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী ক্যাপটেন আহসান মালিকের নেতৃত্বে স্কুলটিকে সুরক্ষিত ক্যাম্পে পরিণত করে। চারদিকে পরিখা, কাঁটাতার, বালির বস্তা এবং বাঁশের তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে দুর্ভেদ্য করা হয়। ক্যাম্পের পাশাপাশি স্কুলটি ছিল টর্চার সেল। স্কুলের ভেতরে ঘরটিতে মুক্তিযোদ্ধা ও তার পরিবারকে ধরে এনে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালানো হতো। বর্তমান প্রধান শিক্ষকের কক্ষটি ছিল ক্যাপটেন আহসান মালিকের অফিস কাম মেডিকেল রুম। আহত পাকিস্তানি সেনাদের এখানে চিকিৎসা করা হতো। ত্রিপাল দিয়ে এটিকে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। ক্যাপটেন মালিক বর্তমান স্কুলের ব্যাংক ভবনে অবস্থান করত। ৩১ বালুচ রেজিমেন্টের ২টি কোম্পানি এবং বেশ কিছু রাজাকার রোস্টারের ভিত্তিতে স্কুলে অবস্থান করত। প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও ক্যাম্পের অংশ ছিল।

প্রচলিত আছে স্কুলটিকে এমনভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছিল যে এটি তিন ইঞ্চি মর্টার হামলা অবলীলায় সহ্য করতে পারত। এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ৪ঠা ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ক্যাম্পটির পরিসমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধকালের ক্ষতচিহ্ন স্কুলটি অনেকদিন বহন করেছে। ছোটো-বড়ো ৮টি সম্মুখযুদ্ধের কালের সাক্ষী এই স্কুলটি। নিরাপত্তার স্বার্থে পাকবাহিনী স্কুলের চারদিকে ৫০০ গজের মধ্যে সকল গাছপালা ও ঘরবাড়ি ধ্বংস করে। এই স্কুলটি ১১ নম্বর সেক্টর এবং ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জ সাব-সেক্টরের অধীন ছিল। স্কুলের ৪৮ জন কিশোর ও একজন কিশোরী (চাঁদ সুলতানা, বর্তমানে ময়মনসিংহে একটি ব্যাংকে কর্মরত আছেন) সরাসরি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অবিস্মরণীয় সাহসী ভূমিকার জন্য এদের মধ্যে তিনজনকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত হন। একটি স্কুল থেকে ৪৯ জন শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ ও তিনজনের বীরপ্রতীক উপাধি প্রাপ্তি একটি বিরল ঘটনা।

বিদ্যালয়ের খেতাব প্রাপ্তদের একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান বীরপ্রতীক। ১৯৫৩ সালে ১লা জানুয়ারি জন্ম নেয়া এই বীর কিশোর দশম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় পালিয়ে ১৯৭১ সালের ১লা মে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ভারতের তুরা ক্যাম্পে দুই মাসের ট্রেনিং গ্রহণ করে বাহাদুরাবাদ আন্ডারচরসহ বিভিন্ন স্থানে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন। ২৯ শে নভেম্বর নিজ স্কুলকে পাকবাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করতে ৭টি গ্রেনেডসহ সাথি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আক্রমণ করেন। পাকবাহিনীর পালটা আক্রমণে তিনি ডান পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। মুক্তিযোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হলে তিনি ড্রেন ও ছন ক্ষেতের মধ্যদিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ২ কি.মি. পথ পাড়ি দিয়ে কামালপুর ব্রিজে পৌঁছান। স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। তিনি দিল্লি ও পুনেতে চিকিৎসা নিলেও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেননি। বর্তমান হুইলচেয়ারে চলাফেরা করে। সম্প্রতি স্ট্রোক হওয়ায় কথাও ঠিকমতো বলতে পারে না। অসীম বীরত্বের কারণে বাংলাদেশ সরকার তাকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করে।

বিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষার্থী বশির আহমেদ বীরপ্রতীক ১৯৫৭ সালে ১৫ই মে বৈষ্ণবপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। দশম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় মাত্র ১৪ বছর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এপ্রিলের প্রথমে যুদ্ধে গিয়েছিলেন কিন্তু বয়স কম হওয়ায় ভারতীয় ক্যাম্প কমান্ডার মহেন্দ্রগঞ্জ ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। পরে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বাবা-মার অনুমতি নিয়ে যুদ্ধে যান। দুই মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে কামালপুরে কয়েকটি সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বীরত্ব গাথা চলচ্চিত্রের কাহিনিকেও হার মানায়। ৪ঠা ডিসেম্বর ভারতের বর্মনপাড়া অস্থায়ী ক্যাম্পটিতে যৌথবাহিনীর কমান্ডার ভারতীয় ব্রি. জেনারেল হরদেব সিং ক্লেয়ার কামালপুর আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। আক্রমণের আগে পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু আত্মসমর্পণের চিঠি কামালপুর ক্যাম্পে পৌঁছানো নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। মৃত্যুকূপে কেউ আসতে রাজি না হলেও কিশোর মুক্তিযোদ্ধা বশির আহমেদ সানন্দে রাজি হন। জীবনের ঝুঁকি জেনেও যৌথ বাহিনীর কমান্ডার ব্রি. জেনারেল হরদেব সিং ক্লেয়ারের চিঠি নিয়ে সকাল ৮.৩০মি.-এ স্কুল ক্যাম্পে আসেন কিশোর বশির আহমেদ। সাদা পতাকাসহ আটক করে তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয় পাকবাহিনী। বশির আহমেদের আসতে দেরি হওয়ায় সঞ্জু নামে আর একজনকে ঐ ক্যাম্পে পাঠানো হয়। দুইজনেরই আসতে বিলম্ব হওয়ায় যৌথবাহিনী বোমা বর্ষণ শুরু করে। অল্পের জন্য বেঁচে যান বীর মুক্তিযোদ্ধা বশির আহমেদ বীরপ্রতীক। ভীত হয়ে পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণে রাজি হয়। ৬৭ জন বালুচ সৈন্য ও ৪০ জন রাজাকার এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসহ ক্যাপটেন মালিকের নেতৃত্বে পাকিস্তানিবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। পরে তাদেরকে ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এটিই সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ। জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে অসম সাহসিকতার জন্য বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়।

স্কুলের আর একজন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা (যুদ্ধাহত) নূর ইসলাম বীরপ্রতীক। অকুতোভয় এ বীর সেনানীর জন্ম ১৯৫৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর ধানুয়া গ্রামে। দশম শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ভারতের তেল ঢালা ক্যাম্পে ২৮ দিন প্রশিক্ষণ নিয়ে বদিউল আলমের কোম্পানির অধীন কামালপুর, কর্ণজোড়া ও নকসীসহ বিভিন্ন রণাঙ্গনে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। সেপ্টেম্বর মাসে উঠানুর পাড়ায় বকশীগঞ্জ কামালপুর সড়কে পাকসেনাদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। এই যুদ্ধে তার সাথি অনেকেই শাহাদত বরণ করেন। নূর ইসলাম কাফি হাজীর বাড়ির পিছনের ডোবায় গলা সম পানিতে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে প্রাণে বেঁচে যান। ১৭ই অক্টোবর, ১৯৭১ তিনি ভারতের মাঝপাড়ায় থেকে ভোরবেলা কামালপুর ক্যাম্প আক্রমণ করার জন্য সাথি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অগ্রসর হন। বাংলাদেশ সীমান্তে পৌঁছানোর সাথে সাথেই ওঁত পেতে থাকা পাকহানাদার বাহিনী তাদের দলের উপর ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। দলের সম্মুখভাগে থাকা কিশোর নূর ইসলামের পেটে ও বাম

হাতে গুলিবিদ্ধ হয়। পেটের গুলিটি তাঁর পিঠ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। নাড়িভুঁড়ি বের হওয়ায় সেখানেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পাকসেনারা মৃত ভেবে তাকে ফেলে চলে যায়। সাথি মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে তাঁকে তুরা হাসপাতালে, পরে গুহাটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে। লক্ষ্ণৌ ও কলকাতায় চিকিৎসা গ্রহণ করলেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেননি এই অসীম সাহসী কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে আজো বেঁচে আছেন বীরপ্রতীক মুক্তিযোদ্ধা নূর ইসলাম। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর এ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত করে। ধানুয়া কামালপুর মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়। এর মাটি ভিজে আছে শত শত মুক্তিযোদ্ধার পবিত্র রক্তে। শহিদের তালিকায় আছেন ক্যাপটেন আলম ও ফেনীর সন্তান ক্যাপটেন সালাউদ্দিন মমতাজসহ শত শত নাম জানা-অজানা মুক্তিযোদ্ধা। স্কুলের পাশেই তাদেরকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। শুধু ৩১শে জুলাই তারিখের যুদ্ধেই শহিদ হন শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা। কামালপুরে যুদ্ধ করে আহত হয়েছেন কর্নেল আবু তাহের বীরউত্তম, মেজর হাফিজ, সুবেদার হাইসহ আরো অনেকেই। মেজর মঈনুল ইসলাম (পরে মেজর জেনারেল হয়েছিলেন), সৈয়দ সদরুজ্জামান হেলাল, আনিসুল হক সঞ্জু, যৌথ বাহিনীর ভারতীয় ব্রি. জেনারেল হরদেব সিং ক্লেয়ার ও মেজর জোহর সিংসহ অনেকেই কামালপুর যুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য এখানে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ, শহিদ বেদী এবং ডাক বাংলো তৈরি করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ কর্নার, একটি বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপনসহ ৪৯ জন শিক্ষার্থীর নাম সংবলিত নামফলক স্থাপন করা হলে পরবর্তী প্রজন্ম জানতে পারবে মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বিদ্যালয়ের অনন্য ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ধানুয়া কামালপুর কো-অপারেটিভ উচ্চ বিদ্যালয়টি চিরভাস্বর হয়ে থাকবে । ■

জন্মভূমি

আবিদ হোসেন

বাংলা আমার জন্মভূমি
বাংলা আমার মান
তাই তো তোমায় ভালোবেসে
ভরে নাকো জান।
রাখাল যখন বাজায় বাঁশি
মিষ্টি মধুর সুরে
সুরের সাথে গান গেয়ে যায়
ঘুঘু পাখি দূরে।
সে গান আমার
মন ছুঁয়ে যায়
প্রাণে লাগে দোলা
অনেক কাজের মাঝেও তাই
যায় না তোমায় ভোলা।

১০ম শ্রেণি, যাত্রাবাড়ী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

রাসেল সোনা

মোহাম্মদ ইলইয়াছ

ধানমন্ডির লেকের পাড়ে রাসেল সোনা থাকত
সবুজ কুঁড়ি বেতের ঝোপে সোনার স্বপন আঁকত
ধানমন্ডির লেকের জলে চেলা-পুটির বাস
সেসব দেখে রাসেলমনির কাটত দিন-মাস।

সাইকেলটা প্রিয় ছিল, গাছের ছায়ায় ঘুরত
পায়রাগুলোর খাবার দিয়ে মনের আশা পুরত
আপুমণি, ভাইয়ার কাছে তাঁর ছিল না বায়না
ধলপ্রহরে তাঁর আবাসে ঢুকল খুনি-হায়না।

হায়নাগুলো রাসেল সোনার অবুঝ প্রাণ কাড়ল
শিশু হত্যার মানবতা এক নিমিষে হারাল–
আগস্ট এলে সেই ছবিটা শোক সাগরে ভাসায়
ব্যথার মাঝে বেঁচে আছি, অনেক স্বপ্ন আশায়।

সাগরে সাঁতার কাটা সহজ কেন?

তারেকুর রহমান

জিতু বসে বসে টিভি দেখছে। টিভিতে অনেকগুলো সাগর, নদী দেখাচ্ছে। মানুষ ছুটি কাটাতেই এসব জায়গায় ছুটে যায়। কেউ সাগরের পাড়ে বসে বসে গল্প করছে। আবার কেউ কেউ সাঁতার কাটে। এসব দেখে জিতুর মনে একটা প্রশ্ন জাগল, আচ্ছা কোথায় সাঁতার কাটা সহজ? নদীতে? নাকি সাগরে? নাকি নদী এবং সাগরে একই রকম। জিতু দৌড়ে গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করল আচ্ছা বাবা কোথায় সাঁতার কাটা সহজ? নদীতে নাকি সাগরে?' জিতুর বাবা একটু চিন্তা করে বলল, 'সাগরে সাঁতার কাটা সহজ'। জিতু বাবার উত্তর শুনে জিজ্ঞেস করল,' সাগরে সাঁতার কাটা সহজ কেন?' জিতুর বাবা তাকে বলল,' আচ্ছা শোন তাহলে, সাগরে সাঁতার কাটার পেছনে বিজ্ঞান কাজ করছে। তাহলে কী বিজ্ঞান কাজ করছে তা জানতে হবে। শোন, নদীর পানির চেয়ে সাগরের পানিতে লবণের পরিমাণ বেশি। তাই সাগরের পানির ঘনত্ব বেশি হয়। ঘনত্ব বেশি হওয়ায় সমুদ্রের পানির স্রোত বেশি হয়। প্লবতা বেশি হওয়ার কারণে সাগরে সাঁতার কাটলে সাঁতারুর শরীর হালকা মনে হয়। এ কারণে নদীর চেয়ে সাগরে সাঁতার কাটা সহজ হয়।'

জিতু বাবাকে বলল,' দারুণ তো,অনেক কিছু শিখলাম।' বাবা বলল,' তুমি কি ডেড সি –এর নাম শুনেছ?'

জিতু উত্তর দিলো, হুম শুনেছি। ডেড সি কে বাংলায় মৃত সাগর বলে।

এবার জিতুর বাবা বলল,' ঠিক ধরেছ, ডেড সি ইসরাইল এবং জর্ডানে অবস্থিত। এই ডেড সি-তে সমুদ্রের পানি থেকে ৮ গুণের চেয়েও বেশি লবণ রয়েছে। এ কারণে ডেড সি-তে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নাই। এমনকি ওখানে মানুষ ভেসে থাকতে পারে না।'

বাবার থেকে এ তথ্য পেয়ে জিতু অবাক হলো। 'আচ্ছা বাবা কোনো পরীক্ষা করে এটা দেখাতে পারবে না?'

বাবা বলল, 'অবশ্যই পারব। এটা এমন এক পরীক্ষা তুমি তোমার বন্ধুদের চমকে দিতে পারবে। তুমিই হয়ে যাবে বিজ্ঞানী।'

জিতুকে সব কিছু তার বাবা শিখিয়ে দিয়েছে। জিতু বাবার কথা মতো কাজ শুরু করতে লাগল। এখন নিজেকে বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী মনে হচ্ছে। দুটো স্বচ্ছ পানির গ্লাস এনে টেবিলের উপর রাখল। একটা ডিম, পানি আর লবণ আনা হলো। প্রথমে গ্লাস দুটোতে সম পরিমাণ পানি নেওয়া হলো। একটা গ্লাসে কয়েক চামচ লবণ মিশ্রিত করে নেওয়া হলো। দুটো গ্লাসের একটাতে লবণ মিশ্রিত পানি। আরেকটায় শুধু পানি নেওয়া আছে। এবার জিতু ডিমটা নিয়ে শুধু পানি দেওয়া গ্লাসে রাখল। ডিমটি একদম গ্লাসের তলায় চলে গেল। ডিমটি নিয়ে এবার সে লবণ মিশ্রিত পানির গ্লাসে রাখল। সে দেখল ডিমটি ভেসে আছে। এটা দেখে জিতু চিৎকার করে বলল, 'ইয়াহু আমি বিজ্ঞানী হয়ে গেলাম।' জিতুর বাবা তার কাণ্ড দেখে হাসছে। লবণের কারণে ডিমটি ভেসে ছিল। দারুণ একটা পরীক্ষা হয়ে গেল। ■

হরিণ ছানা আর বাঘ

আরিফুল ইসলাম

গভীর বনে একা একা ঘুরে বেড়ায় আর গান গায় ছোট্ট এক হরিণ ছানা। গান গাইতে গাইতে খাবার খোঁজে। কচি কচি ঘাস তার খুব প্রিয়। বাবা-মার কাছ থেকে শুনে হরিণ ছানা জানে, বনের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো প্রাণী আছে। যারা হরিণ ছানাকে খাওয়ার জন্য ওত পেতে আছে। কিন্তু খেতে হলে তাকে ধরতে হবে তো!। হরিণ ছানা যখন এসব ভাবছিল তখন হঠাৎ সে এক বাঘের গর্জন শুনতে পেল। পাশে তাকাতেই দেখতে পেল বিশাল এক বাঘ। হরিণ ছানাকে দেখে বাঘ বলল, আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমি তোমাকে খাব।

হরিণ ছানা বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধি খুঁজতে লাগল। হঠাৎ তার চোখ গর্ত ভর্তি কাদা পানির দিকে পড়ল। সে বলল, এই কাদা পানির মজাদার শরবত নিয়ে এখনই আমাকে সিংহ রাজার কাছে যেতে হবে। এই শরবত হলো পৃথিবীর সেরা শরবত। এই শরবত খেলে বুদ্ধি আর শক্তি বাড়ে। আর এই শরবত না নিয়ে গেলে সিংহ রাজা আমাকে আস্ত খেয়ে ফেলবে–এই বলে হরিণ ছানা পাশের গর্ত থেকে কিছু কাদা পানি তুলে বাঘকে দেখাল।

বাঘ বলল, তা না হয় বুঝলাম কিন্তু

সিংহ রাজা কেন একা একা শরবত খাবে? আমিও এই শরবত খেতে চাই। সিংহ রাজার কাছ থেকে কিছুটা শরবত যদি আমাকে দাও তাহলে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি।

হরিণ ছানা বলল, সিংহ মামা এ কথা শুনলে খুব রেগে যাবে। বাঘ বলল, একটু দাও না ভাই, রাজা কিছুই জানতে পারবে না। ঠিক আছে। আমি চলে গেলে এই মজাদার শরবত খেও, হরিণ ছানা বলল।

বাঘ বলল, ঠিক আছে তুমি যাও। বাঘ গর্ত থেকে কাদা পানির শরবত মুখে নিয়ে বলে উঠল। এ তো শুধুই কাদা পানি। কোথায় পৃথিবীর সবচেয়ে মজাদার শরবত। রেগেমেগে বাঘ চলে গেল হরিণ ছানার খোঁজে। এক সময় হরিণ ছানাকে খুঁজে পেল সে। হরিণ ছানা বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্য আবার বুদ্ধি খুঁজতে লাগল। সে বলল, রাজা আমাকে এখানে পৃথিবীর এক আশ্চর্য বাদ্যযন্ত্র পাহারা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন।

বাঘকে একটি মৌচাক দেখিয়ে হরিণ ছানা বলল, এখানে জোরে ঢিল মারলে মধুর বাজনা বাজতে থাকে। সিং রাজা যখন খুশি হন তখন এই বাদ্যযন্ত্রে জোরে জোরে ঢিল মারে। রাজা চায় না এই বাজনা অন্য কেউ শুনুক।

বাঘ কান পেতে শুনল মৌচাক থেকে গুনগুন শব্দ হচ্ছে। সে বলল, আচ্ছা, তোমাকে আমি এবারও ছেড়ে দেবো যদি সিংহ রাজার প্রিয় এই বাদ্যযন্ত্র শুনতে দাও। হরিণ ছানা বলল, আমি যাচ্ছি তুমি বাজনা শুনতে থাকো। হরিণ ছানা যাওয়ার পর বাঘ মস্ত বড়ো একটি ঢিল ছুঁড়ে মারল মৌচাকে। সঙ্গে সঙ্গেই মৌচাকে মৌমাছিরা তাড়া করল বাঘকে। মৌমাছির হুল খেয়ে দৌড়াতে লাগল বাঘ। বাঘ

যত দৌড়ায় মৌমাছিরাও উড়ে উড়ে তত কামড়ায় তাকে। শেষে এক দিঘিতে ঝাঁপ দিয়ে পানির নিচে ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ থাকল সে। এ দিকে অপেক্ষা করে মৌমাছিরা চলে গেল। বাঘ রেগে আবার হরিণ ছানাকে খুঁজতে লাগল। এক সময় হরিণ ছানাকে দেখে বাঘ বলল, আমাকে কাদা পানি খাইয়েছ। মৌমাছির কামড় খাইয়েছ। এবার আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।

হরিণ ছানা কি বলবে ভাবতে লাগল। এমন সময় সে দেখল পাশেই কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে এক অজগর সাপ ।

অজগরকে দেখিয়ে সে বলল, রাজা আমাকে এখানে পাঠিয়েছে তার কোমরের বেল্ট পাহারা দেওয়ার জন্য। এই বেল্টটি হলো জাদুর বেল্ট। এ বেল্ট পরার পর মনে মনে যা খেতে চাওয়া যায় তাই এসে সামনে হাজির হয়।

বাঘ বলল, আচ্ছা! তোমাকে এবার ছেড়ে দিতে পারি যদি এই জাদুর বেল্টটি একবার পরতে দাও। হরিণ ছানা বলল, আমি চলে গেলে এই বেল্ট পরবে।

বাঘ বলল, ঠিক আছে আমি এই বেল্ট পরে ইচ্ছামতো খাওয়া দাওয়া করব। খুব খিদে পেয়েছে আমার।

হরিণ ছানা চলে যাওয়ার পর অজগরের লেজ তুলে কোমরে প্যাঁচাতে লাগল বাঘ। এ দিকে লেজে নাড়া লেগে অজগরের ঘুম গেল ভেঙে । ঘুম ভাঙার কারণে অজগরের খুব রাগ হলো। অজগর রেগে গিয়ে বাঘকে গিলে খেতে চাইল । বাঘ যখন টের পেল সে অজগরের কবলে পড়েছে তখন ছাড়া পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

সে চিৎকার করে হরিণ ছানাকে ডাকতে লাগল । এদিকে হরিণ বাঘের হাত থেকে বাঁচার আনন্দে মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর গান গাইছে–

ছোটো আমি হরিণ ছানা মোটেও আমি বোকা না।
যত ইচ্ছা চেষ্টা করো ধরতে আমায় পারবে না। ■

ফুলকুঁড়ি

মো. হাসু কবির

ছোটো শিশু ফুলকুঁড়ি
নিষ্পাপ অতি
চাঁদমুখ জুড়ে তার
ভালোবাসা প্রীতি।
হাসিতে যেন মুক্তা
কান্নায় মায়া
চাহনিতে কী যে জাদু
স্নেহমাখা কায়া।
আধো আধো বোলে তার
ফোটে যেন খই
হাঁটি হাঁটি দুই পায়
স্বপ্নের মই।
মন তার কাদা মাটি
ছন্দের গতি
মনন বিকাশে দিও
উৎসাহ অতি।

আমরা শিশু

মায়মুনা হোসেন

ফুলের মতো ফুটতে হবে
ছুটতে হবে দূরে
বিশ্বটাকে জানতে হলে
দেখতে হবে ঘুরে।
আমরা শিশু সদ্য ফুল
মন দিয়ে পড়ালেখা করব
পড়ালেখা করলে তবে
জীবনে হব বড়ো।

৮ম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল, রূপগঞ্জ, ঢাকা

দোয়েলের শিস

আরাফাত শাহীন

টিনের চালের ওপর এখনো টুপ টুপ বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। গায়ের কাঁথাটা আরেকটু ভালো করে টেনে নিল পুতুল।

সকাল হয়েছে বেশ খানিক আগে। রোজ ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায় পুতুলের। আজও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ঘুম ভাঙলে পুতুল টের পেল বেশ জোরেশোরে বৃষ্টি হচ্ছে; একেবারে ঝুম বৃষ্টি যাকে বলে। বৃষ্টির সাথে সাথে বাতাসও হচ্ছে বলে মনে হলো। তবে কয়েকদিন আগে যেমন ভয়ানক ঝড় বয়ে গিয়েছিল তেমন নয়। বাতাস বেশ শান্তভাবেই প্রবাহিত হচ্ছে।

বৃষ্টির মধ্যে ঘুম থেকে উঠে কাজ নেই- এই চিন্তা করে পুতুল আবার ঘুমিয়ে পড়ল। আসলে এখন ওর চোখে ঘুমের তেমন তীব্রতা নেই। চোখ এবং শরীর জুড়ে রাজ্যের আলস্য এসে ভর করেছে। চোখ খুলতেই ইচ্ছে করছে না।

বৃষ্টি একেবারে থেমে গেলে আড়মোড়া ভেঙে বিছানা ছেড়ে উঠে বসল ও। এখন আর না উঠলেই নয়। আরও কিছুক্ষণ যদি এভাবে শুয়ে থাকে তাহলে আম্মু এসে রাগারাগি করবেন। এখন স্কুল বন্ধ। তাই তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তবে আম্মু চিন্তা করতে পারেন, পুতুল হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এজন্য ঘুম থেকে উঠতে দেরি হচ্ছে। আসলে ও আব্বু-আম্মুকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চায় না।

আকাশে সূর্যের কোনো দেখা নেই। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর যদি সূর্য ওঠে তাহলে সবকিছু কেমন ঝলমল করতে থাকে। পুতুল বহুবার এমন দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। আজ অবশ্য তেমন কোনো লক্ষণ নেই। আকাশটা ঘন কালো মেঘে ছেয়ে রয়েছে। আবারও কি বৃষ্টি শুরু হবে নাকি? আকাশের যে মতিগতি তাতে আগবাড়িয়ে কিছু বলবার জো নেই।

পুতুল বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ঘুম থেকে জেগে ওর অভ্যাস হলো প্রথমে আকাশের দিকে তাকানো। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির আশেপাশের সমস্ত গাছপালার ওপর দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকা। এতে ওর মনটা নিমিষেই ভালো হয়ে যায়। আজ আকাশের মন খারাপ দেখে ওর মনটাও ভার। প্রকৃতিতেও কেমন যেন একটা ভারী ভাব বিরাজ করছে। গাছের পাতা বেয়ে টুপটাপ করে এখনো পানি ঝরে পড়ছে বাড়ির আঙিনায়। পুতুল বারান্দা থেকে নেমে উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে বুকভরে শ্বাস টেনে নিল। তারপর ওভাবেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

আম্মু রান্নাঘরে রান্না চড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি একদম ভোর থাকতেই উঠে পড়েন। আম্মুকে কখনো বেলা হলে উঠতে দেখেনি পুতুল। প্রতিদিন তিনি অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়েন। আর কাজও শুরু করেন সেই ভোরবেলায়। পুতুলকে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আম্মু একটা হাসি দিয়ে বললেন, 'আমার পুতুল সোনার ঘুম কি ভাঙল অবশেষে? আমি তো মনে করেছিলাম আজ বুঝি সে ঘুম থেকে উঠবেই না!'

আম্মুর কথা বলার ধরন দেখে ফিক করে হেসে দিলো পুতুল। কয়েকদিন আগেই সামনের সারির একটা দাঁত পড়েছে ওর। পুতুলের ফোকলা দাঁতের হাসি দেখে দাওয়ায় বসা দাদু মজা করে বললেন, 'আমাদের পুতুল সোনার হাসি তো আমার মতো হয়ে গেছে। আমারও যেমন দাঁত নেই, ওরও তেমন দাঁত নেই।'

দাদু ফিকফিক করে হাসতে লাগলেন।

পুতুল কপট রাগ দেখিয়ে বলল, 'মজা করবেন না দাদু। আমি কি আপনার মতো বুড়ো হয়ে গেছি নাকি?'

'আমি বুড়ো হয়েছি একথা তোমাকে কে বলল শুনি?'

দাদু অবাক হওয়ার অভিনয় করলেন। কাজটা তিনি বেশ ভালোই পারেন। তবে পুতুলের চোখ এড়িয়ে সেটা সম্ভব নয়।

'কে আর বলবে! আপনার চুলও তো সব পেকে সাদা হয়ে গেছে!'

'চুল পাকলেই বুঝি মানুষ বুড়ো হয়ে যায়?'

'হয় না তো কী?'

দাদুকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে লাফাতে লাফাতে আম্মুর কাছে চলে এল পুতুল। এখন ও মায়ের পাশে বসে থাকবে, যতক্ষণ রান্না শেষ না হয়।

দুই.

বাড়িতে আম্মুর কাজে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করে পুতুল। অবশ্য এই কাজ ও হাসিমুখেই করে থাকে। আম্মু অবশ্য ওকে তেমন কোনো কাজ করতে দিতে চান না। তবে দাদু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তিনি বলেন, 'সবাইকেই কিছু না কিছু কাজ করা শিখতে হয়। এতে করে মন যেমন ভালো থাকে তেমনি শরীরটাও ভালো থাকে।'

দাদুর এমন কথা শুনলে পুতুলের তার সঙ্গে মজা করার ইচ্ছে হয়। ও প্রশ্ন করে, 'তাহলে তুমি কোনো কাজ না

করে সারাদিন ঘরে বসে থাকো কেন?'
'আমি বুড়ো হয়ে গেছি তো, কাজ করব কীভাবে?'
'তাহলে যে বলো তুমি এখনো বুড়ো হওনি। সে কথা কি মিথ্যা...!

দাদু পুতুলের এই কথার কোনো জবাব দিতে পারেন না। তাকে এমন বেকায়দায় ফেলতে দেখে আম্মু দ্রুত পুতুলকে কাছে ডেকে নিয়ে বোঝান।

'মুরুব্বি মানুষের সাথে কেউ এমন আচরণ করে?'

পুতুল বলে, 'দাদুর সঙ্গে একটু মজা করলাম শুধু। তুমি তো জানো, আমি দাদুকে কতটা ভালোবাসি।'

আম্মু ঠিকই জানেন পুতুল ওর দাদুকে খুবই ভালোবাসে। দাদুও ওকে অসম্ভব ভালোবাসেন। দু'জনার মধ্যে ভাবও বেজায়। দাদু এটা-ওটা লুকিয়ে রেখে প্রায়ই পুতুলকে কাছে ডেকে হাতে দেন। বিষয়টা ওর ভীষণ ভালো লাগে।

সকালের খাবার সময় হলে আম্মু পুতুলকে গাছ থেকে লেবু পেড়ে আনতে বললেন। আব্বু লেবু ছাড়া ভাত খেতে পারেন না। আবার পুতুলও লেবু বেশ পছন্দ করে।

উঠোনের এক কোণেই বেশ বড়োসড়ো একটা লেবু গাছ। কাগজি লেবু। রসে বেশ ঘ্রাণ। এমনকি পুতুল শুঁকে দেখেছে, পাতাতেও অসম্ভব রকমের সুন্দর ঘ্রাণ। লেবু গাছটা বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। দেখতে বড়োসড়ো একটা ঝোপের মতো। গাছের গোড়া নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। তা না হলে ঘন আগাছায় পরিপূর্ণ হয়ে যেত। লেবু ছিঁড়তে গিয়ে পুতুল খেয়াল করে দেখল, গাছের নিচে কী যেন একটা নড়াচড়া করছে। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ও দেখতে পেল, একটা দোয়েল পাখি একেবারে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে।

ছোট্ট শরীরটা বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়ে গেছে। পাখিটা ওড়ার ক্ষমতা হারিয়েছে। একটা ছোট্ট পাখিকে ওভাবে ছটফট করতে দেখে লেবু ছেঁড়ার কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠল পুতুল। দোয়েল পাখির কষ্টটা যেন একেবারে ওর কলিজায় গিয়ে বিঁধেছে।

পুতুলের চেঁচামেচির শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আব্বু এবং ছোটো ভাই রাসেল। ততক্ষণে পুতুল দোয়েলটাকে হাতের ওপর তুলে নিয়েছে। কত সুন্দর ছোট্ট নরম শরীর! এই পাখিটার কষ্ট হলে পুতুল সেটা কীভাবে সহ্য করতে পারে! আব্বু উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে মামনি? হাতে লেবু গাছের কাঁটা ফুটেছে নাকি?'

'না আব্বু, কাঁটা ফোটেনি। একটা দোয়েল পাখির ছানা বৃষ্টিতে কেমন ভিজে চুপসে গেছে। এখন কী উপায় হবে?'

'দেখি কী অবস্থা পাখিটার?'

বিষয়টা আব্বুকেও গভীরভাবে স্পর্শ করল।

হাতের তালুর ওপর রাখা পাখিটা আব্বুর দিকে এগিয়ে দিলো পুতুল। তিনি বেশ খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'অবস্থা বেশ নাজুক বলে মনে হচ্ছে। একে তো বাঁচানো মুশকিল হয়ে যাবে।'

'যে-কোনো উপায়েই হোক না কেন পাখিটাকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে। একটা উপায় ভেবে বের করো না আব্বু।'

পুতুলের কণ্ঠ থেকে কাকুতি ঝরে পড়ল।

আব্বু কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'একটা উপায় অবশ্য আছে। তবে তাতে কতটুকু কাজ হবে বলা মুশকিল।'

'কী উপায় সেটা?'

পুতুলের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আব্বু ওকে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে গেলেন।

তিন.

কিছুক্ষণ হলো আম্মু রান্না শেষ করেছেন। চুলোয় এখনো আগুন। আব্বু পাখিটাকে চুলার আগুনের তাপে ধরে ওর শরীরটাকে গরম করতে লাগলেন।

'আব্বু, ওকে চুলার খুব কাছে নিও না। তাপ বেশি লাগলে পালক পুড়ে যেতে পারে।'

উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল পুতুল। ওর কাছে মনে হচ্ছে আব্বু বোধ হয় ঠিকমতো পাখিটার যত্ন নিতে পারবেন না।

পুতুলের কথা শুনে আব্বু হেসে দিলেন। তিনি বললেন, ‘একদম চিন্তা করো না। আমি তো তোমাকে দেখিয়ে দিলাম। এখন তুমিই পাখিটার পরিচর্যা করবে।’

আব্বু দোয়েলটাকে পুতুলের হাতে তুলে দিলেন। ও হাতে নিয়ে দেখল শীতে পাখিটা এখনো কাঁপছে। কতক্ষণ ধরে বৃষ্টিতে ভিজেছে কে জানে!

ধীরে ধীরে উষ্ণতা পেয়ে পাখিটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে লাগল। পুতুলের মনে আনন্দ যেন ধরে না। ওর কাছে মনে হলো, এ যাত্রায় পাখিটা বুঝি বেঁচেই গেল। একটা প্রাণকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনার মতো সুখ আর কিছুতেই হতে পারে না। এটা তো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। পুতুল এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে কেন!

একবার স্কুলের বারান্দায় একটা শালিকের বাচ্চা পড়ে ছিল। কীভাবে সেটা ওখানে এল তা কেউ বলতে পারে না। পুতুলদের ক্লাসের সবাই বাচ্চাটাকে ঘিরে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু কেউ বাচ্চাটাকে হাতে তুলে নিতে সাহস করেনি। এমন সময় জাহানারা ম্যাম এলেন। তিনি স্কুলের সবচেয়ে কঠোর ম্যাম হিসেবে পরিচিত। তার সামনে কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না। তিনি আসতেই সবাই রাস্তা থেকে সরে পথ ছেড়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ম্যাম ছানাটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পরম মমতায় হাতে তুলে নিলেন। ক্লাসের সবাই অবাক হয়ে ম্যামের দিকে তাকিয়ে রইল। ম্যাম ওদের মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, ‘শোনো, তোমরা কাজটা মোটেও ঠিক করোনি।

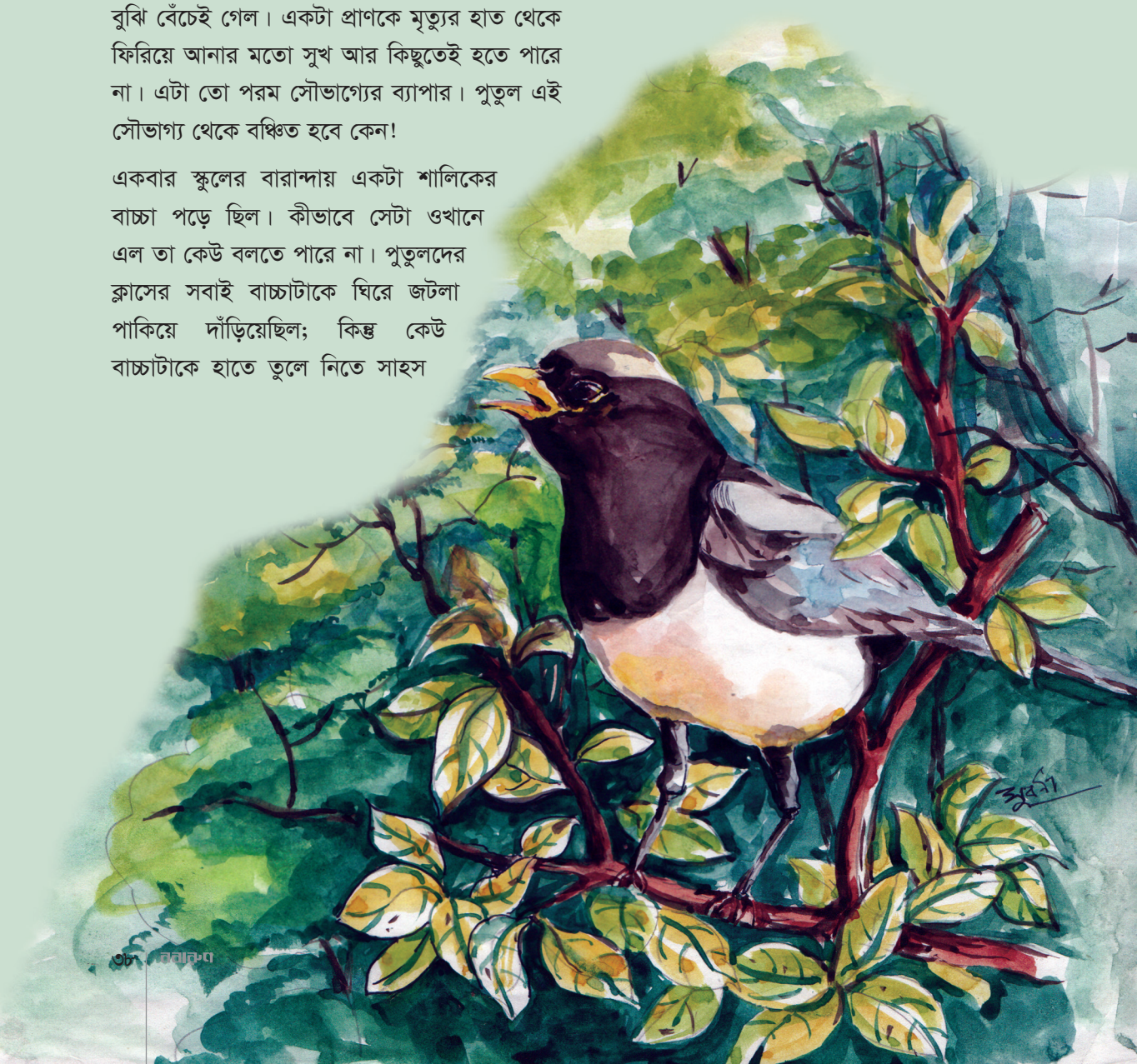

একটা পাখির ছানা এখানে ছটফট করছে আর তোমরা দাঁড়িয়ে দেখছ- এটা ঠিক নয়। তোমাদের উচিত ছিল ছানাটাকে তুলে যত্ন করে রাখা।'

'আমরা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কী করব।'

সবার পক্ষ থেকে পুতুল উত্তর দিলো।

ম্যাম বললেন, 'আমরা কোনো অসুস্থ মানুষের যেমন সেবা করি, তেমনি অসুস্থ পশুপাখিদেরও সেবা করতে হবে। মনে থাকবে?'

সবাই একবাক্যে বলল,' জি, মনে থাকবে।'

ম্যাম বলতে লাগলেন, 'আমাদের এই ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতিনিয়ত পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। পাখিরা দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি তারা আমাদের এ সুন্দর পৃথিবীটাকে আরও সুন্দর রাখতে সহায়তা করে। তাহলে আমাদের কি উচিত নয় তাদের প্রতি খেয়াল রাখা?'

পুতুল এক পা এগিয়ে এসে জবাব দিলো, 'পাখিদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা অবশ্যই কর্তব্য। পাখিদের অযথা কষ্ট দেওয়াও ঠিক নয়।'

পুতুলের কথায় সন্তুষ্ট হলেন জাহানারা পারভীন। তিনি পাখিটাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। কয়েকদিন পর পুতুলদের সামনে পাখিটাকে মুক্ত করে দিলেন তিনি। ততদিনে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে শালিক ছানাটা। সবার ভেতর দারুণ একটা ভালো লাগা কাজ করতে লাগল।

চার.

দাদু বারান্দায় বেশ খোশমেজাজে বসে আছেন। আজ ঠিক কী কারণে তার মনটা এত ভালো সেটা বোঝা যাচ্ছে না। পুতুলকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনি হাসিমুখে বললেন, 'কী খবর পুতুল সোনা, তোমার দোয়েল পাখিটা কেমন আছে এখন?'

'পাখিটা এখন বেশ সুস্থ। তবে দাদু, সে তো কিছু খেতে চাচ্ছে না!'

পুতুল ভারাক্রান্ত মনে জবাব দিলো।

'এটা তো বেশ চিন্তার বিষয়!'

দাদু কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর পুনরায় বললেন, 'তবে আমার মনে হয়, চিন্তার তেমন বিশেষ কিছু নেই। ওটা এমনিতেই একটা ছোট্ট বাচ্চা। তাছাড়া এমন পরিবেশে এখনও তেমন একটা মানিয়ে নিতে পারেনি বোধ হয়।'

'মানিয়ে নিতে পারেনি কেন?'

পুতুলের চোখেমুখে জিজ্ঞাসা।

'একটা বিষয় চিন্তা করে দেখো। পাখিটা এতদিন ওর বাবা-মায়ের আদরযত্নে বেড়ে উঠেছে। ওর মা ওকে খাবার এনে খাইয়ে দিয়েছে। এখন হঠাৎ করে এত দ্রুত ও কীভাবে একা একা খেতে পারবে?'

'তাহলে কী করব দাদু? আমি কি ওকে ধরে খাইয়ে দিয়ে আসব?'

'সেটা বোধ হয় করা লাগবে না। ক্ষুধা লাগলে একাই ঠোকর মেরে খেতে পারবে। এটা ওদের জন্মগত ব্যাপার। একটু সময় পেলেই অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। তুমি একদম চিন্তা করো না।'

'ঠিক আছে।'

পুতুল যেন খানিকটা আশ্বস্ত হলো।

'আচ্ছা পুতুল সোনা, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে?'

উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে পুতুল ওর দাদুর দিকে তাকালো। ও জানে দাদু এখন ওকে মজার কোনো বিষয় শেখাবেন। তিনি যখন কোনো বিষয়ে জানাতে চান তখন এভাবেই কথা বলতে শুরু করেন। পুতুলের বেশ ভালো লাগে।

'কী প্রশ্ন দাদু?'

পুতুল প্রশ্ন না করে পারল না।

'জগতের সব পাখি তো সুন্দর করে ডাকে, মধুর সুরে গান গায়। ঠিক না?'

‘হ্যাঁ ঠিক।’

ছোট্ট করে জবাব দিলো পুতুল।

‘একটা পাখি শিস দেয়; ঠিক মানুষের মতো। বলো তো সেটা কোন পাখি?’

বেশ চিন্তায় পড়ে গেল পুতুল। এমন আজব কথা তো সে কোনোদিন শোনেনি। পাখি আবার মানুষের মতো শিস বাজাতে পারে নাকি? দাদু কী সব উলটাপালটা কথা বলছে!

‘আচ্ছা দাদু, তুমি আবার আমার সঙ্গে গুল মারছ না তো?’

পুতুলের চোখে–মুখে হতাশ।

দাদু মিটিমিটি হাসছেন। তিনি বললেন, ‘এই প্রশ্নের জবাব আমি তোমাকে দেবো না। তুমি নিজেই উত্তর খুঁজে বের করবে।’

পুতুলের চিন্তা আরও বেড়ে গেল। সে কি পারবে ‘শিস দেওয়া পাখি’ খুঁজে বের করতে?

দোয়েল ছানাটি এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে। পুতুল এবং ওর ছোটো ভাই রাসেল মিলে পাখিটার খুব যত্ন নিয়েছে। রাসেল অবশ্য খানিকটা দুষ্টুমি করেছিল। পুতুলের ধমক খেয়ে সে শান্ত হয়েছে। প্রথম দিকে খাবার না খেলেও পরে সেটা ঠিক হয়ে যায়। খেয়েদেয়ে সে বেশ সুখেই আছে।

একটা পাখিকে খাঁচায় আটকে রাখা পুতুলের পছন্দ নয়। ও ঠিক করল পাখিটাকে ছেড়ে দেবে। এটা জানতে পেরে রাসেল বায়না ধরে বলল, ‘আপু, পাখিটাকে না ছেড়ে দিয়ে চলো পুষি। এটা থেকে অনেক বাচ্চা হবে।’

পুতুল খানিকক্ষণ চোখ পাকিয়ে থেকে বলল, ‘পাখিকে খাঁচায় আটকে রাখা ঠিক নয়। এতে ওরা অনেক কষ্ট পায়। পাখিদের কষ্ট দেওয়া কি ঠিক?’

রাসেল ঘাড় নেড়ে বলল, ‘তা ঠিক নয়। তাহলে চলো উড়িয়ে দিই।’

‘এই তো আমার লক্ষ্মী ভাইটি।’

ওরা দুজন বাড়ির সামনের ফাঁকা মাঠে চলে এল। বিকেলের পড়ন্ত রোদে সারা মাঠ ঝকমক করছে। পুতুল পাখিটাকে হাতের তালুতে নিয়ে ছেড়ে দিলো। কিছুক্ষণ হাতের ওপর বসে থাকার পর ফুড়ুৎ করে উড়াল দিলো পুবের দিকে। তারপর একটা গাছে গিয়ে বসল। দুই ভাইবোন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িতে ফিরে এল।

পাঁচ.

পরদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘুম ভেঙে গেল পুতুলের। জানালা খুলে দক্ষিণ দিকে তাকালো ও। জানালার সাথেই একটা কাঁঠাল গাছ। হঠাৎ গাছের পাতার ফাঁকে কোথায় যেন শিস বেজে উঠল। অবাক হয়ে গাছের দিকে ভালোমতো তাকালো পুতুল। আরে! এ যে একটা দোয়েল পাখি বসে রয়েছে। আবারও শিস বাজানোর শব্দ পাওয়া গেল; সেই সাথে পাওয়া গেল দাদুর করা একটা প্রশ্নের উত্তরও।

পুতুল জীবনে দোয়েল পাখি কম দেখেনি। ওদের বাড়িতেই প্রচুর দোয়েলের আনাগোনা। যেহেতু সে দোয়েল দেখেছে তাহলে নিশ্চয়ই ওদের ডাকও শুনেছে। তাহলে দাদু যখন প্রশ্ন করল তাহলে উত্তর দিতে পারল না কেন? তাহলে কি এরই নাম পর্যবেক্ষণ?

দোয়েল পাখিটা বহুক্ষণ হলো কাঁঠাল গাছে বসে আছে। তার চলে যাওয়ার কোনো লক্ষণই যেন নেই। পাখিটা একমনে শিস বাজিয়েই চলেছে। গতকাল পুতুল যে দোয়েলটাকে ছেড়ে দিয়ে এল এটা কি সেটাই? হতেও পারে। এটা নিয়ে ভাবার সময় খুব কম। পুতুলকে এখন ওর দাদুর কাছে যেতে হবে গতকালের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য। এতক্ষণে ঘুম থেকে দাদুর উঠে পড়ার কথা। ■

প্রশ্ন মাকে

ফারুক হাসান

লক্ষ্মী সুমা প্রশ্ন করে মাকে ডেকে কয়,
আকাশ কোলে কেমন করে চাঁদ-তারারা রয়?
হরেক রকম পাখির মতো সূর্য কোথা যায়
সাঁঝ আসে ওই কালি মেখে, কেমন করে হায়?

গড়-গড়-গড় রাগে ভীষণ কেন ডাকে মেঘ,
কোত্থেকে যে ঝড় আসে ওই, এতই কেন বেগ,
চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে দুর্বা সবুজ ঘাসে
সবুজ কণায় ঝিকিমিকি মায়ের ছবি হাসে।

প্রাণের বাংলাদেশ

আমিরুল হক

আকাশ জুড়ে মেঘের ভেলা
মেঘের ওপর আকাশ
কাশের বনে ঢেউ খেলে যায়
উদাসী বাউরি বাতাস।

পাখির গানে ঘুম ভেঙে যায়
সোনালি সূর্য ওঠে
ঝিলের জলে শুভ্র রঙিন
শাপলা কমল ফোটে।

ফুল ফসল আর সোনালি ধানে
মায়ের মুখের হাসি
অলস দুপুর গাছের ছায়ায়
রাখাল বাজায় বাঁশি।

গাঁয়ের মেঠো পথের ধারে
তাল-তমালের সারি
মায়ের মতো গাঁয়ের ছবি
মন শুধু কাড়ি।

সবুজ-শ্যামল বন-বনানির
স্নিগ্ধ পরিবেশ
ছয়টি ঋতুর গাঁথা মালার
নাই তুলনার শেষ।

এখানেই আমার জন্ম মাগো
এটাই আমার দেশ
আমার প্রিয় জন্মভূমি
প্রাণের বাংলাদেশ।

বুদ্ধিমান তাঁতি

আশরাফ আলী চারু

রাজা মহাশয় সিংহাসনে বসে আছেন। এমন সময় অন্য রাজ্যের এক দূত এসে সিংহাসনের চারপাশে একটি গোল দাগ দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। রাজা মহাশয় কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু দূত কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল। অবশেষে রাজামহাশয় রাজসভায় উপস্থিত গণ্যমান্য সবাইকে দূতের দেওয়া এই দাগের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে বললেন। কেউ কিছু বলতে পারল না দেখে রাজা মহাশয় রাজ্যের জ্ঞানী মানুষদের ডেকে এনে এর কারণ খুঁজে বের করে জানাবার আদেশ দিলেন।

জ্ঞানী মানুষ খোঁজার জন্য সৈন্যরা রাজ্যের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কোথাও জ্ঞানী মানুষের দেখা মিলল না। ঘুরতে ঘুরতে তারা একটি কুটির দেখতে পেল। কুটিরে কোনো মানুষ আছে কিনা দেখার জন্য ভেতরে প্রবেশ করল। কিন্তু না কোনো মানুষ নেই , তবে একটা দোলনা আপনা আপনিই দুলছে। এটা দেখে খুব আশ্চর্য হলো তারা। পরের কুটিরেও একই অবস্থা দেখে আরো আশ্চর্য হলো। এবার গেল ছাদে। সেখানে আরো এক অবাক কাণ্ড! ছাদে গম নেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর গম খাওয়ার জন্য পাখি উড়ছে গমের ওপর। কিন্তু হুগলা পাতার পাখা এমন ভাবে ঘুরছে যে পাখিগুলো গম খাওয়ার জন্য বসতে পারছে না। অথচ এখানে কোনো লোকও দেখতে পাচ্ছিলনা সৈনিকেরা। ছাদ থেকে নেমে পরের কুটিরে প্রবেশ করে একজন লোককে কাপড় বুনা অবস্থায় দেখতে পেল তারা। কাছে গিয়ে দোলনা চলা ও ছাদের হুগলা পাতার পাখা ঘুরার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইল তারা। তাঁতি বুঝিয়ে বলল , ওগুলো এখান থেকে তাঁতের চাকায় সুতো বেঁধে চালানো হয়। সৈনিকেরাও সুতো দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। অবশেষে তারা এই তাঁতিকে জ্ঞানী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে

বিদেশি দূতের সেই দাগ টানার ঘটনার কথা খুলে বলল। তাঁতি সব শুনে বাচ্চাদের খেলনার দুটি গুটি আর একটা মুরগি ঝাঁপিতে করে নিয়ে সৈনিকদের সাথে রাজ দরবারে চলে এল।

তাঁতি বিদেশি দূতের সামনে গুটি দুটি এগিয়ে দিলো। গুটি দুটি দেখে দূত এক সময় বীজ রাখলো মেঝের ওপর। তাঁতিও একটু হেসে তার ঝাঁপি থেকে মুরগি বের করে ছেড়ে দিলো। মুরগি সব বীজ খেয়ে ফেলল। এরপর আর কোনো কিছু না করে বিদেশি দূত চুপচাপ চলে গেল।

এবার রাজা জিজ্ঞেস করলেন এসবের অর্থ কী?

তাঁতি এবার জবাবে বলল, দূতের চারদিকে দাগ দেয়ার অর্থ হলো ওদের রাজা এই রাজ্য দখল করে নিতে চায়। দাগের অর্থ তারা সৈন্য সামন্ত দিয়ে আমাদের রাজ্য ঘেরাও করে রেখেছে।

-তুমি গুটি এগিয়ে দিলে কেন? জিজ্ঞেস করলেন রাজা মহাশয়।

- গুটি দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিলাম আমরা ওসবের পরোয়া করিনা, আমাদের কাছে তোমরা খুব শিশু তাই গুটি নিয়ে খেলা করো।

- বীজ দিলো কেন?

-বীজ দিয়ে সে বুঝাতে চাইছিল ওদের অসংখ্য সৈন্য সামন্ত আছে, আর আমি মুরগি দিয়ে বীজ খাইয়ে বুঝিয়ে দিলাম তোমরা যুদ্ধ করতে এলে একজন সৈন্যও আমাদের এখান থেকে বেঁচে ফিরবে না।

- দূতটা ওসব বুঝল তো?

- বুঝল বলেই তো তাড়াতাড়ি পালাল।

এবার রাজা মহাশয় তাঁতিকে প্রস্তাব দিলো– তুমি আমার এখানেই মন্ত্রী হিসেবে থেকে যাও তাঁতি।

তাঁতি একটু হেসে বলল, রাজা মহাশয়, বাড়িতে নিজেরই কত কাজ- কি করে থাকি আপনার এখানে! এই বলে সে বিদায় নিয়ে চলে গেল। ■

[আর্মেনীয় কাহিনির অবলম্বনে রচিত।]

ফাতিমা তাহানান, ৪র্থ শ্রেণি, খিলগাঁও গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

রাজহাঁস ও বনবিড়াল

ওয়াহিদ মুস্তাফা

এক দেশে ছিল ৪টি রাজহাঁস। তাদের মধ্যে একটি রাজহাঁসের ৪টি বাচ্চা ছিল।

চারটি রাজহাঁস থেকে তিনটি রাজহাঁস ঘুরতে গেছে। একটি রাজহাঁস ও বাচ্চাগুলো বাড়ি আছে। রাজহাঁসটা ঘুম থেকে উঠে খাবার খাচ্ছে।

আবার কিছুক্ষণ পরে বনবিড়াল এসে রাজহাঁসটাকে ধরে নিয়ে যায়। তাঁর পরে এক একটা করে হাঁসের বাচ্চা কমে যাচ্ছে।

হাঁসেরা ফিরে এসে সব দেখে। কী করা যায় কী করা যায়, হাঁসেরা এই চিন্তা করছে। তারপর না– একটা বুদ্ধি আসে। সবাই বলছে, কী বুদ্ধি কী বুদ্ধি?

তখন মা হাঁসটা বলে, আজকে আমরা এই বনবিড়ালকে ধরব।

–এই, এই সবাই চুপ! বনবিড়াল এই তো এসে গেছে, জাল ফেল। জাল ফেল বলেই জাল ফেলে।

তখন বনবিড়াল বলে– হাঁসভাই, হাঁসভাই, আমাকে ছেড়ে দাও না!

– না, তোর কোনো ছাড়ান নাই, তোরে আমরা মারবই। তুই আমাদের একটি রাজহাঁস আর বাচ্চাদের খেয়েছিস!

–খাই নাই, খাই নাই। সব জঙ্গলে বেঁধে রেখেছি। এই হাঁসেরা, তোরা সবাই বাইরে আয়। আমাকে বাঁচা।

তখন রাজহাঁস আর বাচ্চারা বাইরে আসে। আর বনবিড়ালও ছাড়া পায়, পালিয়ে যায় জঙ্গলের দিকে। ■

ওয়াহিদ মুস্তাফা, শিশু শ্রেণি, শিশুকলি নার্সারি স্কুল, বাঘারপাড়া, যশোর

শিখতে হলে দেখতে হবে

শাহানা আফরোজ

'ইচ্ছে আমার বড়ো হবো, দু-হাত দিয়ে আকাশ ছোঁবো'- গানের এই শিরোনাম যেন সব শিশু-শিক্ষার্থীর জীবনের একান্ত চাওয়া। আর এই চাওয়াকে বাস্তবে রূপ দিতে সবার জন্য শিক্ষা ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা জরুরি। এই লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালের স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও জেন্ডার সমতা বাস্তবায়নে ক্লাসে 'শাহানা কার্টুন' ব্যবহার করার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা, ইভটিজিং প্রতিরোধসহ বিভিন্ন গল্প আছে এই কার্টুনে। পুরুষের মতো নারীর শিক্ষাও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে। গল্পের প্রধান চরিত্র শাহানা নামের শিশু শিক্ষার্থী।

বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা, ইভটিজিং, বাল্যবিয়ের কুফল, নারীর ক্ষমতায়নসহ সমাজের নানা সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজে ১৭ বছরের কিশোরী শাহানা। বন্ধুদের সহায়তায় সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে তার উদ্যোগ সফল হয়।

পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় পড়ানোর সময় শিক্ষকরা যাতে কারিকুলামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শাহানা কার্টুন–এর পর্বগুলো ব্যবহার করে সহজে শিক্ষা দিতে পারে সে জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কার্টুনটি তৈরি করেছে ইউএনএফপিএ। ছয়টি পর্ব নির্ধারণ করা হয়েছে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী।। মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ মাধ্যমিক পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসার (দাখিল) নির্দিষ্ট ক্লাসেও দেখানো হবে কর্টুনটি।

শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে ২৬ শে জানুয়ারি, ২০২০ আঞ্চলিক উপপরিচালকদের চিঠি পাঠিয়ে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে এই কার্যক্রম বন্ধ আছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুললে শাহানা কার্টুনের সিডি সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হবে। তবে কিশোর বাতায়নে ও ইউটিউবে কার্টুনটি আপলোড করা হয়েছে। ইউটিউবের Shahana cartoon in bangla লিখে সার্চ দিলে কার্টুনটি দেখা যাবে। আগামীতে এ কর্টুনের সাথে আরও পর্ব যুক্ত করা হবে বলেও জানান মাউশির পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ড. প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য্য। বন্ধুরা, এসো এবার জেনে নেই ৬টি পর্বের শাহানা কর্টুনে কি কি আছে।

শাহানা ও তার সাথিরা

এটি শাহানা সিরিজ এর প্রথম পর্ব। সিরিজটি বাল্যবিবাহ বন্ধ করার একটি উদ্যোগ। আমাদের

দেশে প্রায় ৫৯ শতাংশ মেয়ের ১৮–এর আগে বিয়ে হয়ে যায়। অল্প বয়সে বিয়ে হবার কারণে তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে থাকে। কেমন করে শাহানা এবং তার বন্ধুরা তাদের এলাকায় বাল্যবিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করছে। শাহানারা কি পারবে এই সমাজকে বদলে দিতে? দেখতে হলে চোখ রাখো এই পর্বে।

আঠারোর পরে

মতবল ঘটক আবারো একজন অল্প বয়সি মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেছে। সে আর কেউ

নয়। শাহানাদের পাশের বাড়ির মেয়ে শিমু। শিমু ক্লাস সেভেন -এ পড়ে কিন্তু সে আরও পড়াশুনা করতে চায়। শাহানা কি পারবে তার কিশোর-কিশোরী ক্লাবের বন্ধুদের নিয়ে এই বিয়েটা বন্ধ করতে?। জানতে হলে চল ঘুরে আসি শাহানার রাজ্য থেকে।

সঠিক সময়ের সঠিক যত্ন

শাহানা এবং তার বন্ধুরা কলেজ থেকে একটি কাজ পেয়েছে। একজন কৃষক কেমন করে মাঠে কাজ করে এবং ফসল ফলায় তা তারা দেখবে এবং শিখবে। সেখানে তাদের সাথে পরিচয় হয়

কৃষক চাচা আর তার মেয়ে হাফিযার সাথে। কৃষক চাচা তার মেয়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন। কেন হাফিযা সবসময় এত মন খারাপ করে। আবার হাফিযা কারো সাথে মিশেও না। শাহানাকে এই বিষয়গুলো খুব ভাবায় । শাহানা কি পারবে হাফিযাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে? জানতে হলে এই পর্বটি দেখতে হবে।

আমরাই রুখব

হাবু আর তার কয়েকজন বন্ধু মিলে গ্রামের কিশোরীদের বিভিন্নভাবে উত্ত্যক্ত করে। এবার

হাসি এবং শাহানাদেরও খুব উত্তক্ত করছে। আমাদের সমাজে ইভটিজিং একটি বড়ো ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। শাহানা আর তার বন্ধুরা কি পারবে হাবুদের বোঝাতে যে নারী নির্যাতন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ? হাবুরা কি বুঝতে পারবে তাদের ভুল? জানতে হলে দেখতে হবে কার্টুনটির শেষ পর্যন্ত।

নতুন অনুভূতি নতুন চিন্তা

শাহানা তার বন্ধুদের নিয়ে নতুন নাটকের অনুশীলন করছে। শাহানা পরের দৃশ্য বুঝিয়ে

দেবার সময় খেয়াল করল শিউলি আজ আসেনি। এই সময় আবার আরেকটি খবর এল যে মতলব ঘটক রানুর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেছে তাদের বাড়িতে। শাহানা চলল শিউলির খোঁজ নিতে । এছাড়া কিশোর -কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালের নানারকম স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ক তথ্য জানা যাবে শাহানার এই পর্ব থেকে।

আমরাও পারি

মিলি শাহানাদের নতুন বন্ধু। খুব ভালো ছবি আঁকে এবং স্বাবলম্বী হতে চায়। মিলির মায়ের

সময় কাটে টেলিভিশনে সিনেমা দেখে এবং তিনি মনে করেন মেয়েরা একা কোনো কিছু করতে পারে না। কিছুদিন পর শাহানা লক্ষ্য করে মিলি তাদের এড়িয়ে চলছে। হাসি তখন জানায় যে মিলির বাবা অনেক অসুস্থ এবং তার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন।

এখন মিলি কি করবে? মিলি কি পারবে তার বাবার চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে? মিলির মা কি বুঝতে পারবে মেয়েরাও পরিবারের জন্য অনেক কিছু করতে পারে? জানতে হলে চোখ রাখো শাহানার এই পর্বে। ■

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

প্রতি বছর ১৫ই অক্টোবর দিনটি 'গ্লোবাল হ্যান্ড ওয়াশিং ডে' বা বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস হিসেবে পালিত হয়। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে দিবসটি পালিত হয়। পৃথিবীর মানুষকে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ও এর গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করাই এ দিবসের উদ্দেশ্য। ২০০৮ সালের ১৫ই অক্টোবর সুইডেনের স্টকহোমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা মোর্চা 'পাবলিক প্রাইভেট পার্টনার শিপ ফর হ্যান্ডওয়াশিং' সর্বপ্রথম হাত ধোয়া দিবসটি পালন করে। রোগ প্রতিরোধে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়তে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

প্রথমে স্কুলের শিক্ষার্থীরা এ ক্যাম্পেইনের মূল টার্গেট হলেও অল্পকিছু দিনের মধ্যে বিশ্বজুড়ে সব বয়সি মানুষের মধ্যে প্রতিদিন সঠিক নিয়মে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং ডায়রিয়া সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনাই এই ক্যাম্পেইনের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিদিন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া অভ্যাসে পরিণত করতে এ দিনটি সারাবিশ্বের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। হাত ধোয়ার মতো সাধারণ অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস,ডায়রিয়া ও কৃমির আক্রমণ এমনকি বর্তমানে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের আশঙ্কাও অনেকাংশে কমে যায়। হাতের লোমকূপের গোড়ায় এক বর্গমিলিমিটার জায়গায় ৫০ হাজার জীবাণু থাকতে পারে, যা খালি চোখে দেখা যায় না। বিভিন্ন বস্তু স্পর্শ করার মাধ্যমে এসব জীবাণু হাতে আসে। এই হাতে অন্য জনকে স্পর্শ করলে তার মধ্যেও জীবাণু ছড়ায়।

ময়লা আবর্জনা স্পর্শ করার পর, হাত দিয়ে নাক স্পর্শ করার আগে হাত ধুতে হবে। এছাড়া টয়লেট করার পরে এবং খাওয়ার আগে হাত অবশ্যই জীবাণু মুক্ত করতে হবে। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বে ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়ায় মারা যায় সবচেয়ে বেশি মানুষ। নিয়মিত হাত ধুলে এসব রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে অনায়াসেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সঠিক নিয়মে হাত ধোয়ার অভ্যাস একটি ভালো ভ্যাকসিনের চেয়েও বেশি

কাজ করে। তাই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শুধু খাবার আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পর সঠিক নিয়মে হাত ধোয়ার অভ্যাস সহজেই রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

করোনা প্রতিরোধে হাত ধোয়া

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নিয়মিত বিরতিতে হাত ধোয়ার পরামর্শ দিয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। সেই পরামর্শ অনুসারে হাত ধোয়ার কার্যকরী প্রভাব একটি পরীক্ষার মাধ্যমে তুলে ধরেছে 'গুড হেলথ' নামক একটি ব্রিটিশ স্বাস্থ্য সেবা কোম্পানি।

করোনা ভাইরাসের মতো শ্বাসতন্ত্রে আক্রমণকারী ভাইরাসগুলো তখনই ছড়ায় যখন তা চোখ, নাক ও গলার মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হাতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। ভাইরাসটি একজন থেকে আরেকজনে সংক্রমণের প্রধান মাধ্যম হাত। তবে এই ভাইরাসের বিস্তার রোধে সবচেয়ে সহজ, সাশ্রয়ী ও কার্যকর উপায়গুলোর একটি হলো ঘনঘন সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়া। তবে হাতকে পুরোপুরি ভাইরাস মুক্ত করতে হলে ঝটপট হাতে সাবান মাখানো ও আলতোভাবে ধুয়ে ফেললে কাজ হবে না। কার্যকর হাত ধোঁয়ার পদ্ধতির প্রতিটি ধাপ নিচে দেওয়া হলো।

প্রথম ধাপ: প্রবাহমান পানি দিয়ে হাত ভেজানো।

দ্বিতীয় ধাপ: ভেজা হাতের পুরোটায় ভালোভাবে সাবান মাখানো।

তৃতীয় ধাপ: অন্তত ২০ সেকেন্ড হাতের সামনে ও পেছন ভাগে আঙুগুলোর মধ্যে ও নখের নিচের অংশ ভালোভাবে ঘষতে হবে।

চতুর্থ ধাপ: প্রবাহমান পানি দিয়ে পুরো হাত ভালোভাবে কচলে ধুয়ে নিতে হবে।

পঞ্চম ধাপ: পরিষ্কার কাপড় বা শুধু এককভাবে ব্যবহার করা হয় এমন তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে নিতে হবে।

অন্ততঃপক্ষে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড সময় নিয়ে হাত ধোয়া উচিত। পর্যাপ্ত সময় নিয়ে হাত ধোয়া নিশ্চিত করতে হ্যাপি বার্থডে গানটি পুরোটা দুইবার গাওয়ার সময় নেওয়া যায়। হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। ■

আমার ছেলেবেলা

রুস্তম আলী

আমি ছিলাম দুষ্টু অতি
বোশেখ মাসের দুপুর বেলা
হাতে থাকত ঘুড়ি।

বর্ষা এলে–
নদীর তীরে অথই জলে
ভেলায় দিতাম পাড়ি।

সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসতাম
ঘণ্টা পরে 'মা' ডাকত

খেতে এসো - তেলে ভাজা পুরি।

মেঘের খেলা

ইহান মুকসিত

রং-বেরঙের মেঘের ভেলা
আকাশ জুড়ে করে খেলা।
কখনো সাদা কখনো কালো
ধূসর রঙেও লাগে ভালো।

লাল -হলুদে সাঁঝের বেলা
মনের কোণে দেয় যে দোলা।
নানা ঢঙে সাজে মেঘ
এলিয়ে দেয় এলোকেশ।

কখনো হাতি কখনো ঘোড়া
মাঝে মাঝে ফুলের তোড়া।
হালকা পায়ে দুলকি চলে
ভেসে চলে কালে কালে।

পাল উড়িয়ে সোনার তরী
মাঝি যেন হচ্ছে ঘুড়ি।
মেঘ রাজ্যের আল্পনাতে
হারিয়ে যাই কল্পনাতে।

২য় বর্ষ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার কলেজ, কাকরাইল, ঢাকা

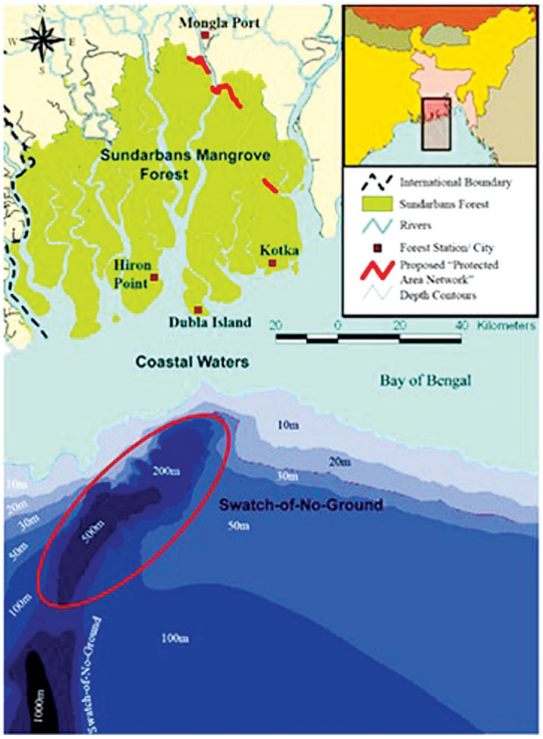

বঙ্গোপসাগরের সবচেয়ে গভীরতম স্থান

ইফতেখার আলম

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা হয়ত অনেকেই জানো পৃথিবীর গভীরতম খাদ কোনটি। হ্যাঁ ঠিক বলেছ, মারিয়ানা ট্রেঞ্চ। কিন্তু তোমরা কি জানো আমাদের দেশেও গভীরতম খাত আছে। বঙ্গোপসাগরে রয়েছে গভীর এই খাদটি। এ জায়গার নাম 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' (Swatch of no ground)। অনেক গবেষকের দাবি মারিয়ানা ট্রেঞ্চের পর এটিই পৃথিবীর দ্বিতীয় গভীরতম স্থান। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সংরক্ষিত এই এলাকা ২০১৪ সালের ২৭শে অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথমে জেনে নেই বঙ্গোপসাগরের ভৌগোলিক অবস্থান। বঙ্গোপসাগর (Bay of Bengal) ভারত মহাসাগরের উত্তরের সম্প্রসারিত বাহু। ভৌগোলিকভাবে ৫° উত্তর ও ২২° দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ৮০° পূর্ব ও ১০০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এ উপসাগরটি পশ্চিমে ভারত ও শ্রীলঙ্কার পূর্ব উপকূল, উত্তরে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীপ্রণালী সৃষ্ট বদ্বীপ এবং পূর্বে মায়ানমার উপদ্বীপ থেকে আন্দামান-নিকোবর শৈলশিরা (Ridges) পর্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগরের তিনদিক ভূভাগ দ্বারা আবদ্ধ। দক্ষিণ সীমা শ্রীলঙ্কার দক্ষিণে দন্দ্রা চূড়া (Dondra Head) থেকে সুমাত্রার উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়তনের বিশাল এলাকা জুড়ে বঙ্গোপসাগর বিস্তৃত। এর গড় গভীরতা প্রায় ২,৬০০ মিটার এবং সর্বোচ্চ গভীরতা ৫,২৫৮ মিটার। বঙ্গোপসাগরের সর্বোত্তর প্রান্তে বাংলাদেশ।

বিশ্বের সেরা ১১টি গভীর খাদ বা ক্যানিয়ন –এর মাঝে অন্যতম 'সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড' (Swatch of no ground)। আজ থেকে প্রায় ১২৫,০০০ বছর আগে তৈরি হয়েছে। 'সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড' বঙ্গোপসাগরের তলায় একটি গভীর উপত্যকা বা মেরিন ভ্যালি। একে আন্ডার ওয়াটার ক্যানিয়নও বলে।

ব্রিটিশরা 'সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড' (Swatch of no ground-SONG) নামকরণ করে। 'সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড' যেখান থেকে শুরু সেখান থেকেই হঠাৎ করে পানির গভীরতা অনেক বেড়ে গেছে। ব্রিটিশরা ধারণা করেছিল সমুদ্রের এই স্থানে খাদের কোনো তলদেশ নেই, এজন্যই এমন নামকরণ করেন তারা। আর এর নামকরণের পেছনে রয়েছে আরো একটি রহস্য। আঠারোশ শতকের শেষ দিকে সম্ভবত ১৮৬৩ সালে গ্যাডফ্লাই নামে একটা ২১২ টনের ব্রিটিশ গানবোট ভারত থেকে ইংল্যান্ডে যাওয়ার পথে ডুবে যায়। ডুবে যাওয়া এই ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজের কোনো নিশানা না পেয়েই ব্রিটিশরা এর নাম দেয় সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড। বঙ্গোপসাগরের গভীরে অবস্থিত জায়গাটির সংক্ষিপ্ত ইংরেজি 'SONG'। ('Swatch of No Ground')। মংলা, সুন্দরবনের দুবলার চর, সোনারচর থেকে প্রায় ৩০-৪০ কি.মি দূরে সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড। এর এলাকা প্রায় ৩,৮০০ বর্গকিলোমিটার। গভীরতা ১০ মিটার থেকে ১০০ মিটার। তবে এর ৭০% এর গভীরতা ৪০ মিটার- এর বেশি। তলদেশ তুলনামূলকভাবে সমতল। যা ৫ থেকে ৭ কি.মি. প্রশস্ত এবং এর প্রাচীরসমূহ ১২ কোণে হেলানো। তলায় রয়েছে কাদা মোশানো বালি। ঘনত্ব প্রায় ১৬ কিলোমিটার। স্থানীয়রা বলে নাই বাম। সাগরে ফুট কিংবা মিটার না ওরা হিসাব করে বাম, দশ বাম, বিশ বাম। আর ঐ জায়গা নাই বাম মানে এই জায়গাটার কোনো হিসাব নাই। জায়গাটা মারিয়ানা ট্রেঞ্চের মতো। বাংলায় বলে অতল স্পর্শী।

এটি সামুদ্রিক অভয়ারণ্য। বঙ্গোপসাগরের মৎস্যভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডে মাছের পাশাপাশি আছে বিশাল আকারের তিমি, ডলফিন, হাঙর, কচ্ছপ আর বিরল প্রজাতির কিছু জলজপ্রাণী। প্রায় দেড় হাজার বর্গমাইলের বিস্তীর্ণ এলাকাটি বিরল জীববৈচিত্র্যের নিরাপদ প্রজননকেন্দ্র। গবেষকদের মতে এ অঞ্চলে রয়েছে তিমি, ডলফিন, সবচেয়ে বড়ো ইরাবতী ডলফিন, ইন্দো-প্যাসিফিক ডলফিন ও পাখনাহীন ইমপ্লাইস ডলফিনসহ বহু সামুদ্রিক প্রাণী। এটি পৃথিবীর একমাত্র সোয়াচ যেখানে তিনটি সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী একসঙ্গে দেখা যায়। তিমি, ডলফিন, হাঙর । এবং এটি কচ্ছপের প্রধান প্রজননক্ষেত্র।

সোয়াচে যে পানি রয়েছে, তা খুবই পরিষ্কার। এই পানির গুণগতমান শ্রীলঙ্কা, ভারত, মিয়ানমার ও মালদ্বীপের চেয়েও উন্নত। বিশেষ করে সুন্দরবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলটি। এটি ইকোলজিক্যাল ফিল্টার হিসেবে কাজ করছে। ■

বিশ্বের প্রথম হলুদ পদ্ম বাংলাদেশে

মেজবাউল হক

পদ্ম ফুল ভাসছে শরতের জলাশয়ে। যা দেখে মোহিত শিশু থেকে বৃদ্ধ মন। প্রকৃতি তার ভালোবাসা এভাবেই বিলিয়ে দেয়। এই ভালোবাসা আরেকটু বাড়িয়ে দিল হলুদ পদ্ম। যা শুধু মাত্র বাংলাদেশেই দেখা মিলেছে। পুরো বিশ্ব খুঁজলেও এ রঙের পদ্মের দেখা মিলবে না।

হলুদ নয় তবে অনেকটাই হলুদাভ। অফহোয়াইটও বলা যায়। এমনই এক নতুন পদ্ম ফুলের দেখা মিলেছে কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার দক্ষিণ গ্রামের বিলে। জলাশয়ে এমন ফুল দেখে বিমোহিত সবাই। পদ্ম ফুলের ভালো লাগা আরো বাড়িয়ে দিল হলুদ পদ্ম। যা বিশ্বে প্রথমবারের মতো ফুটেছে বাংলাদেশে। অসংখ্য পাপড়ির একটি তোড়া যেন সবুজ পাতা ভেদ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ণ ফোটা হলুদ পদ্মের পাশে ফুটেছে একটি গোলাপি পদ্মও। যদিও পাপড়ির দৈর্ঘ্য গোলাপি পদ্মেরই বড়ো।

বিশ্বে মূলত দুই ধরনের পদ্ম ফুল দেখা যায়। যেমন- এশিয়ান বা ইন্ডিয়ান পদ্ম। এর বৈজ্ঞানিক নাম Nelumbo nucifera। অন্যটি আমেরিকান বা ইয়েলো লোটাস। ইয়েলো লোটাসের বৈজ্ঞানিক নাম Nelumbo Lutea. এশিয়ান বা আমেরিকান পদ্মের একটি ফুলে পাপড়ি থাকে ১২ থেকে ১৮টি। বাংলাদেশে ফোটা এই হলুদ পদ্মে পাপড়ির সংখ্যা ৬০টিরও বেশি। ভেতরের পাপড়ি পুংকেশরের সঙ্গে যুক্ত। এই ফুলে পুংকেশরের সংখ্যাও প্রায় তিনশ। তবে এশিয়ান পদ্ম থেকে নতুন এই পদ্ম সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকি আমেরিকান লোটাসের রং ও বৈশিষ্ট্য থেকেও এটি আলাদা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ ও বেঙ্গল প্লান্ট রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যৌথভাবে নতুন জাতের হলুদ পদ্ম নিয়ে গবেষণায় দেখা যায়, বিশ্বের মধ্যে এটা পদ্মের নতুন এক জাত। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে হলুদ পদ্ম হবে অনন্য সংযোজন সাথে থাকবে বাংলাদেশের নাম। ■

পাঁচ কিশোরীর আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ

জান্নাতে রোজী

‘টোয়েন্টিফোর আওয়ার রেস’ নামে হংকংভিত্তিক একটি যুব উন্নয়ন মূলক প্রতিষ্ঠান আয়োজিত সিডিং ক্যাম্পেইন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে বাংলাদেশের কলেজ পড়ুয়া পাঁচ কিশোরীর দল। চূড়ান্ত পর্বে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারউইক, ইউনিভার্সিটি অব নেসিলভানিয়ার মতো খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হারিয়ে বিজয়ী হিসেবে এ পুরস্কার পায় বাংলাদেশের রাঈদা, সেজাল, সেবন্তী, রামিশা ও রাইয়ানের ‘রিলিফ’ নামের একটি প্রকল্প।

প্রতিযোগিতার প্রথম ধাপে এই কিশোরীর দল ‘রিলিফ’ নামে একটি সামাজিক ব্যাবসা প্রকল্পের প্রস্তাব জমা দেয়। তাদের এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে শহুরে বাগান বা আরান গার্ডেনিং-কে জনপ্রিয় করে তোলা। পুরো ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার নার্সারিগুলোকে একটি অনলাইন সেবার মাধ্যমে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা আছে এই ‘রিলিফ’-এ। ক্রেতারা ঘরে বসেই পছন্দের গাছ ছাড়াও টব, সার, মাটিসহ গাছ লাগানোর বিভিন্ন উপকরণ পাবে এই অনলাইন প্লাটফর্মে। এছাড়াও অনলাইনে মালির খোঁজ পাওয়া যাবে, যিনি বাসায় এসে গাছের সব ধরনের পরিচর্যা করবেন।

ভাবনাটা বিচারকদের পছন্দ হয়ে যায়। প্রথম ধাপেই নির্বাচিত সেরা ১০ প্রকল্পের মধ্যে স্থান করে

নেয় 'রিলিফ'। পরে প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী ১০টি দল প্রায় ৬ থেকে ৮ সপ্তাহব্যাপী একটি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। এই সময়ের মধ্যে প্রকল্পের ভাবনাকে আরো উন্নত করতে আয়োজক সংস্থা প্রতিযোগীদের বিভিন্ন পরামর্শ দেয়। ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে যায় প্রকল্পের চূড়ান্ত কাঠামো। প্রকল্পের অংশ হিসেবে একটি ডেমো ওয়েবসাইট বানায় তারা। এরপর ভার্চুয়াল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিচারকদের সামনে পুরো প্রকল্পটি তুলে ধরে বাংলাদেশের মেয়েরা। বিচারকদের রায় আর পাবলিক ভোট সব মিলিয়ে বিজয়ীর খেতাব পেয়ে যায় প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে উপস্থাপিত একমাত্র প্রকল্প 'রিলিফ'।

রিলিফের ভাষ্যমতে, নগরায়ণের প্রভাবে দিন দিন শহর থেকে সবুজের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এমন বাস্তবতায় মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ঘরে ঘরে গাছ পৌঁছে দিতে পারলে অনেকেই গাছ লাগানোতে আগ্রহী হবেন।

পাঁচ কিশোরীর এই দলের সেবন্তী খন্দকার ও সেজাল রহমান পড়ছে ঢাকার সানবীমস স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণিতে। রাঈদা সিদ্দিকী একই বর্ষে পড়ছে দ্যা আগা খান স্কুলে। অন্যদিকে রাইয়ান খান সদ্য এ লেভেল সম্পন্ন করেছে সানিডেইল স্কুল থেকে। আর রামিশা কবির পড়াশোনা করছে হংকং-এর এলপিসি ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড কলেজে। রামিশা-ই মূলত এই প্রতিযোগিতার ব্যাপারে তার বাংলাদেশের বন্ধুদের জানায়। উল্লেখ্য, বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তের ১৫ থেকে ২৩ বছর বয়সি শিক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে। ■

মো. রাফিউল ইসলাম, ৭ম শ্রেণি, শের-ই-বাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা

অবহেলা করো না

মো. জামাল উদ্দিন

ভিটামিন ডি শরীরের অন্যতম উপাদান। আমাদের শরীরের হাড় ও মাংসপেশির জন্য ভিটামিন ডি অপরিহার্য। শরীরে ভিটামিন ডি-এর অভাব এখন প্রায় মানুষেরই দেখা যায়। পৃথিবীর প্রায় এক বিলিয়ন মানুষের মধ্যে ভিটামিন ডি-এর অভাব রয়েছে।

সূর্যের উপস্থিতিতে শরীরে ভিটামিন সংশ্লেষিত হয়। শরীরে সতেজতা বজায় রাখার জন্য ভিটামিন ডি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর অভাবে আমাদের শরীরে বয়ে আনতে পারে বিভিন্ন ধরনের রোগ।

বন্ধুরা, যখনই বুঝবে তোমাদের শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে তা পূরণ করা যায় সেদিকে মনোযোগ দিবে। রোদ থেকে যে ভিটামিন ডি পাওয়া যায় তা আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। ভিটামিন ডি-এর অভাবে শরীরে কী কী সমস্যা হতে পারে তা তোমাদের আগে জানা দরকার।

- ভিটামিন ডি আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যদি তুমি বার বার অসুস্থ হয়ে যাও তবে বুঝতে হবে তোমার শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি আছে।
- ভিটামিন ডি শরীরে ক্যালসিয়ামের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। যদি কখনো নিয়মিত শরীরের হাড় বা পিঠে ব্যথা বোধ হয়, তাহলে বুঝবে এটা ভিটামিন ডি-এর অভাব।
- গবেষণায় দেখা গেছে ভিটামিন ডি আমাদের শরীরে নতুন চামড়া গজাতে সাহায্য করে। শরীরের যে-কোনো অংশে হওয়া ঘা শুকানোর ব্যাপারেও ভিটামিন ডি অপরিহার্য।
- হাড় ক্ষয় হতে শুরু করে শরীরে ক্যালসিয়াম তৈরিতে ভিটামিন ডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃদ্ধ বয়সে যারা হাড়ের সমস্যায় ভোগেন তাদের ক্যালসিয়ামসহ বেশ কিছু খনিজের অভাব পূরণ করতে বলা হয়, সেই সঙ্গে ভিটামিন ডি-এর দিকেও নজর দিতে বলা হয়।

- ভিটামিন ডি-এর অভাবে আমাদের শরীরের মাংসপেশিগুলোতে ব্যথা হয়। ভিটামিন ডি শরীরের মাংসপেশিকে মজবুত করে। শক্ত মাংসপেশি আর শরীরের ব্যথার হাত থেকে রেহাই পেতে ভিটামিন ডি খেতে হবে।
- সুস্থ জীবন শৈলী ও পরিপূর্ণ ঘুম হওয়ার পরও যদি তুমি ক্লান্তবোধ করো, তাহলে বুঝতে হবে তোমার শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি আছে। এই বিষয়টি কখনো এড়িয়ে যাবে না। সেক্ষেত্রে কীভাবে এই ঘাটতি পূরণ করা যায়। সেদিকে নজর দিবে।
- মাঝে মাঝে তোমাদের মনে অবসাদের সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বেশি দেখা যায়। তখন বেশি বেশি ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।
- অতিরিক্ত চুল ঝরা মানে অবশ্যই শরীরে পুষ্টির অভাব আছে। শরীরে ভিটামিন ডি-এর অভাবেও তোমাদের চুল বেশি মাত্রায় ঝরতে পারে।

কীভাবে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি পূরণ করা যায়

ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি পূরণের জন্য তোমরা যা খেতে পারো– ১. ছোটো মাছ, ২. পনির, ৩. ডিমের কুসুম, ৪. মাশরুম, ৫. দুধ, ৬. চিজ ইত্যাদি। এছাড়া নির্ধারিত মাত্রায় ভিটামিন ডি-এর ওষুধ নিতে পারলে, তোমাদের শরীরে ভিটামিনের ঘাটতি পূরণ হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় তুমি যদি প্রতিদিন ১০ মিনিট সূর্যের আলো গায়ে লাগাতে পারো তাহলে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি পূরণ হবে। ■

জায়েদ রাকিব, ২য় শ্রেণি, আলাতুননেসা হাই স্কুল, রামপুরা, ঢাকা

করোনাকালের শিক্ষাজীবন

মুমিনা নাহার সুষমা

করোনা মহামারির কারণে আমাদের জীবন থমকে গেছে। সারা পৃথিবীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও এখন অনেক কিছু খুলে গিয়েছে, যেমন– অফিস-আদালত, মসজিদ, হোটেল, শপিংমল প্রভৃতি। লকডাউন শিথিলের পর সব খুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু মাত্র একটা জিনিসই খোলা হয়নি। আর তা হলো আমাদের বিদ্যালয়।

সেই যে ১৬ই মার্চ আমাদের স্কুল বন্ধ হলো এখনো খুলল না। ৬-৭ মাস হয়ে গেল তাও স্কুল খুলেনি। ১৭ই মার্চ ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। এই বছরটা হলো মুজিববর্ষ। যার কারণে ১৭ই মার্চ আমাদের সবারই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু তা করোনার জন্য বাতিল করা হলো। তারপর থেকেই তো আমরা ঘরবন্দি।

১৬ই মার্চে বন্ধু-শিক্ষকদের প্রিয় মুখগুলো শেষ দেখেছিলাম, তারপর হলো লকডাউন। ঘর বন্দি আমরা সবাই। পড়ালেখা খুব মনোযোগ দিয়ে চালিয়ে গেলাম। তারপর শুরু 'টিভিতে ক্লাস'। এরপর শুরু হলো ইউটিউবে ক্লাস। তারপর জুলাই মাস থেকে শুরু হলো 'জুম ক্লাস'। এই ক্লাসটা আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

মিস এবং বন্ধুদের সবাইকে সরাসরি দেখা যাবে, শোনা যাবে, কথা বলা যাবে, আমি তো খুশিতে আত্মহারা। এখনো চালিয়ে যাচ্ছি জুমের অনলাইন ক্লাস। তবে আমার ৫ম শ্রেণির পিইসি পরিক্ষা বাতিল করা হয়েছে। সেজন্য একটু মন খারাপ হয়েছে। সেই ২০১৬ সালে ১ম শ্রেণিতে থাকা অবস্থায় গুণে গুণে রেখেছিলাম যে এবার পিইসি দেবো। তাও বাতিল।

এখন মাঝে মাঝে স্কুল, স্কুলের মাঠ, দোলনা, শিক্ষক ও বন্ধুদের স্বপ্ন দেখি, সবসময় মনে পড়ে তাদের। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল স্কুল খুলে যাবে, অনেক মজা হবে। কিন্তু কই, কিছুই হলো না। জানি একদিন না একদিন অবশ্যই আমরা আমাদের স্কুলে যাব। দেখা করব শিক্ষক, বন্ধুদের সাথে। নিশ্চয়ই আমরা আঁধার পেরিয়ে আলোয় যাব। সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম আমরা শিক্ষার্থীরা। ■

৫ম শ্রেণি, ভিকারুন নেছা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম

এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম, নাম মাওলিননং (Mawlynnong)। ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পূর্ব খাসি পাহাড় জেলায় রয়েছে এ গ্রাম। শিলং থেকে মাওলিননং এর দূরত্ব মাত্র ৯০ কিলোমিটার। ছবির মতো সাজানো গোছানো এ গ্রামটি 'আন্তর্জাতিক ট্রাভেল ম্যাগাজিন'-এর পক্ষ থেকে এশিয়ার সবচেয়ে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন গ্রাম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে পরপর দু-বার। ওয়ার্ল্ডস ক্লিনেস্ট ভিলেজ (World's Cleanest Village) বলা হয় গ্রামটিকে। পাকা রাস্তার দু পাশে সাজানো পাতাবাহার ও ফুলের গাছ। কোথাও দেখা যাবে না একটু ময়লাও। কিছুদূর পর পর রয়েছে ডাস্টবিন। যা বাঁশ দিয়ে তৈরি। ডাস্টবিনের সকল বর্জ্য থেকে সার তৈরি করা হয়।

এ গ্রামের শিশুরা সকাল হলেই লেগে পড়ে নিজেদের আশপাশ পরিচ্ছন্নতার কাজে। শুধু গ্রামটাই সুন্দর নয়। গ্রামের মানুষের পোশাক এবং পরিবেশও একদম ঝকঝকে-তকতকে। কেউ যেখানে সেখানে থুথু ফেলতে পারে না। কারো সাথে বিরূপ আচরণ করতে পারে না। ফুল তোলা ও গাছের পাতা ছেঁড়াও নিষেধ। গ্রামের বাসিন্দারা প্লাস্টিকের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার উপরে জোর দিয়েছেন। গ্রামের জঙ্গল এবং সবুজায়ন রক্ষা করতে মাওলিননং এর বাসিন্দারা নিয়মিত গাছ লাগান। এই গ্রামটি মেঘালয়ের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। গ্রামের পাহাড়ে একটি ঝরনার ওপরে গাছের শিকড়ের তৈরি সাঁকোও পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান।

নিজস্ব সূর্যের গ্রাম

তোমরা কি এমন একটি গ্রামের কথা কল্পনা করতে পারো যেখানে গ্রামের নিজস্ব একটি সূর্য রয়েছে। নিশ্চয়ই তুমি ভাবছো তা আবার সম্ভব নাকি! হ্যাঁ বন্ধুরা, নিজস্ব সূর্যের গ্রাম এখন বাস্তবেই বর্তমান।

ইতালিতে রয়েছে ভিগানেলা নামের একটি ছোট্ট গ্রাম যার নিজস্ব একটা সূর্য রয়েছে। এ গ্রামটি মিলানের প্রায় ১৩০ কিলোমিটার উত্তরে একটি গভীর উপত্যকার একদম নিচের দিকে অবস্থিত। আর এর চারদিকে রয়েছে উঁচু উঁচু পর্বত। তাই প্রতি বছর নভেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই গ্রামে সূর্যের আলো একেবারেই প্রবেশ করে না। এজন্য এই গ্রামে শীতকালে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে। চাষাবাদ এবং দৈনন্দিন কাজকর্মেরও ব্যাঘাত ঘটে। ২০০৬ সালে বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্ট মিলে একটা পরিকল্পনা করেন। তারা পর্বতের একদম উচ্চতম স্থানে একটি বিশাল আয়না লাগান। আয়নাটির আয়তন ৪০ বর্গমিটার এবং ওজন ১ দশমিক ১ টন। আলো প্রবেশের জন্য আয়নাটি একটি পর্বতের ১ হাজার ১শ মিটার উচ্চতায় স্থাপন করা হয়। এটা লাগানোর ফলে সূর্যরশ্মি আয়নার ওপর পড়ে এবং সূর্যের প্রতিবিম্বিত আলো সারা গ্রামে ছড়িয়ে যায়। এর ফলে মানুষ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসে। এভাবেই ভিগানেলার গ্রামবাসীরা সারা বছর সূর্যের আলো পাওয়ার ব্যবস্থা করে নেয়। ২০০৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ভিগানেলায় সূর্যের আলো প্রতিবিম্বিত করার জন্য নিকটবর্তী পবর্তচূড়ায় অবস্থিত বিশাল আকার আয়নাটির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌বোধন করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে ওই গ্রামের লোকেরা দিনটিকে 'আলোর দিন' হিসেবে উদ্‌যাপন করে।

সানজিদা আক্তার রুপা, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, সন্দ্বীপ আবেদা ফয়েজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

আব্দুর রহমান আবরার, ৫ম শ্রেণি, বঙ্গভবন প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

জাতিসংঘের সর্বকনিষ্ঠ বিচারক

রুবাইয়াত হোসেন

খুদে চিত্রশিল্পী জারীফ জাতিসংঘের সর্বকনিষ্ঠ বিচারক। 'দি ফিউচার ইউ ওয়ান্ট' শীর্ষক আন্তর্জাতিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় সর্বকনিষ্ঠ বিচারক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশের খুদে চিত্রশিল্পী জারীফ সালেহ। জাতিসংঘের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিশ্বের ৫টি মহাদেশের ৮৪টি দেশের কিশোররা এতে অংশ নেয়। যাদের প্রত্যেকের বয়স ১৩ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। জাতিসংঘের ডিরেক্টর জেনারেল টাটিয়ালা ভেলোভায়া জারীফকে ২৭শে আগস্ট এই বার্তা পাঠিয়ে অভিনন্দন জানান। তোমরা শুনে অবাক হবে এই জারীফ ২০১৮ সালে জাতিসংঘের এবং ২০১৯ সালে গ্যাবারন মানবাধিকার দিবস প্রতিযোগিতায় বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে নেয়। ওই প্রতিযোগিতায় ৭০টি দেশের ১৭ হাজার প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। এছাড়া জারীফ জাপানের কানাগাওয়া দ্বিবার্ষিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ী এবং ভারতের টে ডেক্স এসভিনিট আর্ট প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জনকারী। দেশের ভেতরে জাতীয় শিশু দিবসে আরটিভি আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম হয় এই প্রতিভাবান খুদে শিল্পী। এছাড়া জারীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস আর্ট প্রতিযোগিতা-২০২০–এরও বিজয়ী।

আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

রুকাইয়া বিনতে শরীফ, ২য় শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১.ইংরেজি বছরের একটি মাস, ৪.শরীরে কাঁটাযুক্ত প্রাণী, ৬.প্রকৃত, ৫.নানার ছেলে, ৮.একটি আন্তর্জাতিক ভাষা, ১০.বহুল প্রচলিত সবজি

উপর-নিচ: ১.আট পা বিশিষ্ট সামুদ্রিক প্রাণী, ২.এক প্রকার জনপ্রিয় মিষ্টান্ন, ৩.গৃহপালিত প্রাণী, ৬.ডালিম, ৭.তছনছ, ৯.একটি বামন গ্রহ

■	১			২	■	৩	■
■		■	■	৪			■
■		■	৫		■	■	■
৬		৭	■		■	■	■
	■		■	৮			
	■		■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	৯
■	■	■	■	■	১০		

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে-সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হলো।

সংকেত: আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, খাবার, পারদ, নিলয়, আমুদরিয়া, করুণাময়, রুই, গরল, পাতা

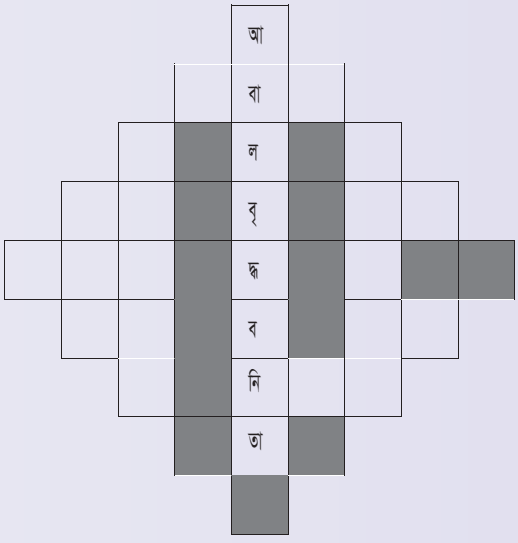

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৮	+		-	৬	=	
+	■	*	■	/	■	+
	+	৪	/		=	৫
-	■	-	■	-	■	+
৪	-		*	১	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	৬	-		=	১১

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপর-নিচ আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৬৩	৬২		৪৮		৪৪	৩		৫
		৫০		৪৬			৭	
	৬০		৫২			১		৯
		৫৮		৫৪		১৬		
৬৭		৬৯	৫৬	৫৫			১৪	
৭৮				৩৬		১৮		১২
			৩৪	৩৭	৩৮		২০	
	৮১			৩০		২৬		২২
৭৫		৭৩	৩২		২৮		২৪	

মুজিববর্ষের ঘোষণা

বন্ধুরা, তোমাদের জন্য সুখবর। নবারুণের 'বুদ্ধিতে ধার দাও' এতদিন খেলে উত্তর পাঠিয়েছ কিন্তু কোনো উপহার পাওনি। এপ্রিল– ২০২০ সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে উপহারের পালা। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ীকে দেওয়া হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার প্রাইজবন্ড। এজন্য নবারুণ পত্রিকার পাতা (ফটোকপি প্রযোজ্য নয়) পূরণ করে বন্ধ খামে পাঠাতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই লিখতে হবে 'বুদ্ধিতে ধার দাও'। পাঠাবে এই ঠিকানায়—

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

বুদ্ধিতে ধার দাও

সেপ্টেম্বর ২০২০ -এর সমাধান

শব্দধাঁধা

	ম	ঙ্গ	ল	বা	র		
	য়				ঞ্জ		
কা	না	মা	ছি		ন		
	ম			গ	র	মি	ল
ম	তি	ঝি	ল		শ্লি		ব
গ		ঙ্গে					ণ
জ		ফু	স	ফু	স		
		ল					

ছক মিলাও

			উ					
		বি	প	দ				
			স		বে			
	কা		বা	ং	লা	দে	শ	
অ	ন	ল		হা			হ	ল
	ন		গ	র	হা	জি	র	
		বী	র		জা	ত		
			ল		র			

ব্রেইনইকুয়েশন

৭	+	৬	-	৮	=	৫
*		/		/		+
২	+	৩	-	৪	=	১
-		+		+		+
৬	+	২	-	৫	=	৩
=		=		=		=
৮	/	৪	+	৭	=	৯

নাম্ব্রিক্স

৪৭	৪৬	৪৫	৪৪	৩	৪	৫	১২	১৩
৪৮	৫১	৫২	৪৩	২	৭	৬	১১	১৪
৪৯	৫০	৫৩	৪২	১	৮	৯	১০	১৫
৫৬	৫৫	৫৪	৪১	৪০	৩৯	২২	২১	১৬
৫৭	৬২	৬৩	৭৮	৭৯	৩৮	২৩	২০	১৭
৫৮	৬১	৬৪	৭৭	৮০	৩৭	২৪	১৯	১৮
৫৯	৬০	৬৫	৭৬	৮১	৩৬	২৫	২৬	২৭
৬৮	৬৭	৬৬	৭৫	৭৪	৩৫	৩২	৩১	২৮
৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৩৪	৩৩	৩০	২৯

সারিকা তাসনিম, ১ম শ্রেণি, চিলড্রেন একাডেমি, চাঁদপুর

ফামিন আজিজ, ২য় শ্রেণি, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল, মতিঝিল

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্যভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-45, No-4, October 2020, Tk-20.00

মো. ইহসানুল হক সিফাত, দ্বিতীয় শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল, মুগদা শাখা, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্যভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা